এ কফিন ফ্রম হংকং

জেমস হেডলি চেজ

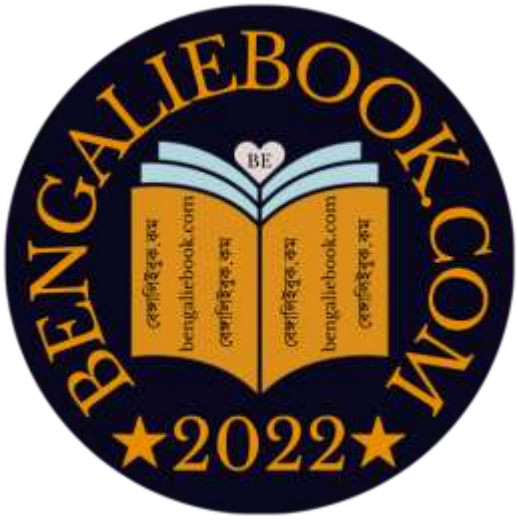

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ.....2
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ.....98
তৃতীয় পরিচ্ছেদ.....173
চতুর্থ পরিচ্ছেদ.....228

প্রথম পরিচ্ছেদ

১.১

বিকেল বেলা, ঠিক ছটা বেজে দশ মিনিট। ঠিক এই সময়ে টেলিফোনটা বেজে উঠল। সারাটা দিন কোন দর্শনার্থী না আসায় খুব বাজে কেটেছে। একটা পয়সার মুখ দেখিনি। এমন কি জরুরী চিঠির খামের মুখগুলো আটকাবারও ইচ্ছা হচ্ছিল না। এমনিএকটা সময়ে হঠাৎ রিসিভারটা বেজে উঠলো।

রিসিভার তুলে বললাম- নেলসন রায়ান। গলার স্বরটা যথাসম্ভব আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করলাম।

কয়েক সেকেন্ড নীরবতায় কাটলো। টেলিফোন লাইনে খুব আস্তে আস্তে একটা শব্দ আমার কানে আসছিল, শব্দটা ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল। মনে হল শব্দটা একটা এরোপ্লেন স্টার্ট নেওয়ার। কিছু অস্পষ্ট গলার স্বর শুনতে পেলাম, তারপরই সেগুলো বন্ধ হয়ে গেল। বুঝলাম বুথের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

মিঃ রায়ান? গম্ভীর পুরুষকণ্ঠ।

–ঠিকই ধরেছেন।

–আপনি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর?

এবারও আপনার অনুমান ঠিক।

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। শুনতে পেলাম ভদ্রলোক গাঢ় নিঃশ্বাস খুব আস্তে আস্তে ফেলছেন। মনে হল আমার কথা খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, আমি এয়ারপোর্ট থেকে বলছি। হাতে সময় খুব কম। আমি আপনাকে কিছু কাজ দিতে চাই, করে দিতে হবে।

লেখার জন্য প্যাডটা টেনে নিলাম।

–আপনার নাম আর ঠিকানা বলুন, আমি বললাম।

জন হার্ডউইক, ৩৩ নং কনট্ বুলেভার্ড।

তাড়াতাড়ি নাম ঠিকানা প্যাডে লিখে প্রশ্ন করলাম–ঠিক কি ধরনের কাজ আমাকে করতে হবে মিঃ হার্ডউইক?

–আমার স্ত্রীর ওপর আপনাকে নজর রাখতে হবে। আবার একটা এরোপ্লেন স্টার্ট নেবার শব্দ পেলাম। আবার নীরবতা।মিঃ হার্ডউইক কিছু বললেন, কিন্তু জেট ইঞ্জিনের আওয়াজে তার কথা শুনতে পেলাম না।

আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না মিঃ হার্ডউইক। যতক্ষণ না এরোপ্লেনের শব্দ মিলিয়ে গেল, উনি চুপ করে রইলেন। তারপর খুব তাড়াতাড়ি বললেন, আমাকে ব্যবসা সূত্রে মাসে দুবার নিউইয়র্ক যেতে হয়। আমার মনে হয় আমি যখন বাড়ি থাকি

না, বাইরে যাই তখন আমার স্ত্রীর চালচলন ঠিক...। যাই হোক, আমি চাই আপনি তার ওপর নজর রাখুন। আমি পরশু অর্থাৎ শুক্রবার ফিরে এসে আপনার কাছে জানতে চাই, আমি যখন থাকিনা সে কি কি করে। তা আপনার দক্ষিণা কত বলুন?

আমি ঠিক এই ধরনের কাজের আশা করছিলাম না। যাই হোক, শুধু শুধু বসে থাকার চেয়ে এটা খারাপ কি?

–আপনি কি করেন, মিঃ হার্ডউইক? প্রশ্ন করলাম। খানিকটা অধৈর্যের সুরে বললেন, আমি হেরন-এ আছি।

হেরন করপোরেশন প্রশান্ত মহাসাগরের এই উপকূল অঞ্চলে একটা নামজাদা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। প্যাসাডেনা শহরের সমৃদ্ধির এক চতুর্থাংশ এরই দান।

–প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ ডলার হিসেবে আর যা খরচপত্র হবে–আমার রেট যা তার দশগুণ বাড়িয়ে বললাম।

–ঠিক আছে। আপনি কাজ শুরু করুন। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাকে তিনশ ডলার পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার কাজ, আমার স্ত্রী কোথায় কোথায় যায়, তার গতিবিধির ওপর নজর রাখা। সে যদি বাড়ি থেকে কোথাও না যায়, তাহলে কে কে তার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করতে আসে, আমি তাও জানতে চাই।

তিনশ ডলারের জন্যে এর চেয়ে অনেক কষ্ট করা যায়। বললাম করব। কিন্তু দয়া করে একবার আসতে পারেন না, মিঃ হার্ডউইক। আমি আমার মক্কেলের সঙ্গে সামনাসামনি একবার আলাপ করতে পারলে খুশী হতাম।

আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার হাতে সময়ের খুবই অভাব। আমি এখনই নিউইয়র্ক চলে যাচ্ছি। তবে শুক্রবার ফিরে এসে আমি অবশ্যই দেখা করব আপনার সঙ্গে। আর আমার এই অনুপস্থিতির সময়টুকুতে আপনি আমার স্ত্রীর ওপর কড়া নজর রাখবেন। এ ব্যাপারে আমি আপনার ওপর ভরসা করতে পারি তো? ·

–অবশ্যই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। খানিকক্ষণ থামলাম। এবার টেলিফোনে একটা এরোপ্লেন নামার আওয়াজ পেলাম।

মিঃ হার্ডউইক, আমি আপনার স্ত্রীর কোন বর্ণনা এখনো পাইনি।

-বললাম তো, ৩৩নং কনট বুলেভার্ড আমার ঠিকানা। আর আমার সময় নেই। আমি যাচ্ছি। ছাড়ছি, শুক্রবার দেখা হবে। লাইন কেটে গেল।

রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। ডেস্কের ওপর রাখা সিগারেট ধরিয়ে বেশ খানিকটা ধোঁয়া টেনে ওপর দিকে ছেড়ে দিলাম।

বছর পাঁচেক হল আমি এই অনুসন্ধানকারী পেশায় কাজ করছি। এর মধ্যে বেশ কিছু ক্ষ্যাপাটে মক্কেল আমাকে সামলাতে হয়েছে। হার্ডউইকও হয়ত এদের মত আর একজন। আবার নাও হতে পারে। মনেহয় লোকটা খুবচাপের মধ্যে আছে।হয়ত

বেশকয়েক মাস ধরেই বউয়ের সন্দেহজনক চালচলনে উদ্বিগ্ন।হয়ত বুঝে উঠতে পারছিলনাকি করবে। শেষ-মেষ এবারেবাইরে যাবার আগে ঠিক করে ফেলেছে ব্যাপারটা জানতে হবে। একটা সদা উদ্বিগ্ন, অসুখী লোক এছাড়া আর কিবা করতে পারে। সে যাই হোক এই বেনামী মক্কেল আর কাজটার কথা ভেবে আমার কিন্তু খুব একটা ভাল লাগছিল না। যার টাকায় কাজ করব, তাকে দেখলাম না, যার ওপর নজর রাখতে হবে তার বিষয়ে কিছু জানলাম না, ব্যাপারটা আমার ঠিক পছন্দ নয়। আমি চাই যার হয়ে কাজ করব, তার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাকবে। ব্যাপারটা তড়িঘড়ি ঠিক করলেও মনে হচ্ছে, এর পেছনে গভীর কোন মতলব কাজ করছে।

এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে ভাবছি, এমন সময় সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ পেলাম। কেউ পা দিয়ে দরজাটায় ধাক্কা মারলো আর দরজাটা খুলে গেল।

একজন পত্রবাহক টেবিলে একটা মোটা খাম রেখে, আমার সই করার জন্যে হাতের খাতাটা এগিয়ে দিল।

লোকটা বেঁটেখাটো। মুখে হাজার দাগ। আমি যখন সই করছিলাম তখন সে আমার অফিস ঘরটা চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। আধা অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে,এককোণেইপত্তর রাখার টেবিল,রঙওঠা এই ডেস্ক, একটা নড়বড়ে চেয়ার আর দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার।

লোকটা যাবার পর খামটা খুলে দেখি দশ ডলারের তিরিশটা নোট আর একটা ছোট চিরকূট–প্রেরক : জন হার্ডউইক, ৩৩ নং কন বুলেভার্ড, প্যাসাডেনা।

প্রথমটায় আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম কারণ আমি বুঝলাম না যে লোকটা এত তাড়াতাড়ি টাকা পাঠালো কি করে? তারপর ভাবলাম যে হার্ডউইকের নিশ্চয়ই এক্সপ্রেস মেসেঞ্জার কোম্পানীর সঙ্গে এরকম টাকাপয়সা পাঠাবার বন্দোবস্ত আছে। আমাকে টেলিফোন করার পর ওদেরও টাকা পাঠাবার জন্য ফোন করে দিয়েছে। আর ওদের অফিস তো আমার অফিস যে ব্লকে তার উল্টোদিকে।

টেলিফোন গাইডটা নিলাম হার্ডউইকের নাম খোঁজবার জন্যে, কিন্তু পেলাম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে বইয়ের টেবিলে স্ট্রীট ডাইরেক্টরীটা দেখতে লাগলাম উল্টে-উল্টে। দেখা গেল, ৩৩ নং কনট বুলেভার্ডে জন হার্ডউইকের নাম নেই, সেখানে থাকেন জ্যাক মায়ার।

ব্যাপারটা কি? প্রথমেই যে চিন্তাটা আমার মাথায় এলো সেটা এইরকম, কনটু বুলেভার্ড শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে অন্ততঃ তিন মাইল ভেতরে পালমা পর্বতের ওপর একটা জায়গা। শহরের, ওপরের বড় রাস্তাটা দিয়ে একটা মাঝারি রাস্তা বেরিয়ে বুলেভার্ডের দিকে গিয়েছে। এখানে লোকেরা সাধারণতঃ ছুটি কাটাতে আসে। জন, হার্ডউইকের মত হেরন কর্পোরেশনের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সম্ভবতঃ এখানে সাময়িকভাবে এই বাড়িটা ভাড়া নিয়ে আছেন, পরে নিজে বাড়ি করে উঠে যাবেন।

বুলেভার্ডে আমি কিছুদিন আগে একবারই গেছি। যুদ্ধের ঠিক পরে এই এলাকাটার একটু উন্নতি হয়েছে, তবে দেখার মত বিশেষ কিছু নেই। সব বাড়িগুলো অর্ধেক ইটের, অর্ধেক কাঠের তৈরী ছোট ছোট বাংলো টাইপের। তবে এখানকার সমুদ্র, দূরের শহরের দৃশ্য আর নির্জনতা সত্যিই উপভোগ করার মত।

আমাকে যে কাজটা করতে হবে সে সম্বন্ধে ভাবতে আমার খারাপ লাগছে। যে মহিলার ওপর নজর রাখবো তাকে কোনদিন চোখে দেখিনি বা তার সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। যদি তিনশ ডলার না পাঠাতো তাহলে হার্ডউইকদের না দেখে কাজটা শুরু করতাম না। কিন্তু টাকাটা নেবার জন্যে আমাকে কাজটা শুরু করতেই হবে।

উঠে পড়ে অফিসের দরজায় তালা লাগালাম। করিডোর দিয়ে হেঁটে লিফটের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

আমার পাশের ঘরটায় একজন কেমিস্টের অফিস, এখনও শুনছি জোরে জোরে সেক্রেটারিকে ডিক্টেশন্ দিচ্ছেন। ভদ্রলোক ব্যবসার জন্যে খুব লড়ে যাচ্ছেন।

লিফটে করে নেমে এসে সামনের রাস্তা পেরিয়ে কুইক স্ন্যাকস বার-এ ঢুকলাম। সাধারণতঃ আমি এখানেই খাই। কাউন্টারের ছেলেটা স্প্যারো আমাকে দেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। অর্ডার দিলাম। বললাম, চটপট কিছু হ্যাম আর চিকেন সান্ডউইচ পাঠাও।

স্প্যারো রোগা, লম্বা, চুলগুলো সাদা। লোকটা খারাপ নয়। আমি মাঝে মাঝে আমার জীবনে ঘটেনি এমন সব দুঃসাহসিক ঘটনা ওকে বলি, আর ও খুব অবাক হয়ে শুনতে থাকে। আমার কাজ সম্বন্ধে ও খুব আগ্রহী।

আজ রাতে কি আপনার কোন কাজ আছে, মিঃ রায়ান? স্যান্ডউইচ তৈরী করতে করতে ও জিগ্যেস করল।

নিশ্চয়ই কাজ আছে। আজ রাতে আমার এক মক্কেলের বউ-এর ওপর নজর রেখে কাটাতে হবে। মেয়েটা যাতে কোন বদমাইশের পাল্লায় না পড়ে।

-তাই নাকি? তা তাকে দেখতে কেমন? স্প্যারোর চোখ দুটো আগ্রহে চক্ করে উঠল।

তুমি এলিজাবেথ টেলরকে দেখেছো?

–হ্যাঁ, হা,

মেরিলীন মুনরোকে?

নিশ্চয়ই! উত্তেজনায় ওর কণ্ঠনালী লাফাতে লাগলো।

আমি একটু হেসে বললাম, ওকে এদেরই মতো দেখতে।

স্প্যারো একটু হকচকিয়ে চোখ পিটপি করলো। পরে আমি মজা করছি বুঝতে পেরে বলল, খুব যে আমাকে ঠকাচ্ছেন, অ্যাঁ।

তাড়াতাড়ি কর স্প্যারো, আমাকে এখন রোজগারের ধান্দায় বেরোতে হবে।

কাগজ মুড়ে স্যান্ডউইচগুলো আমার হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে সে বলল, দেখুন মিঃ রায়ান। পয়সাকড়ি না পাওয়া গেলে ফালতু কোন কাজ করতে যাবেন না।

সাতটা বেজেকুড়ি। গাড়িচালিয়ে কনটু বুলেভার্ডে এলাম।খুব একটাতাড়াহুড়োকরতে হয়নি। যখন পৌঁছোলাম দূরে পাহাড়ের কোলে সূর্য আস্তে আস্তে ডুবে যাছে। এখন সেপ্টেম্বরের শেষ।

কনট্ বুলেভার্ডের বাংলোগুলো রাস্তার ধারেই। সব বাড়ির সামনেই দেখলাম কিছু ঝোঁপ ঝাড় আর ফুল গাছের ঝাড়। আমি খুব আস্তে গাড়ি চালিয়ে ৩৩ নং বাড়িটা পেরিয়ে এলাম। বাড়ির সামনে ডাবল দরজা। প্রায় কুড়ি গজ দূরে রাস্তার ধারে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে সেখানে গাড়িটা থামালাম। সেখান থেকে সমুদ্রটা খুব সুন্দর দেখা যায়। ইঞ্জিন বন্ধ করে আমি ড্রাইভারের সীট ছেড়ে পেছনের সীটে এসে বসলাম, যাতে ঐখান থেকে ডাবল দরজাটা আমি পরিষ্কার দেখতে পাই।

এখন ঠায় বসে থেকে অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই, আর এতে আমার আপত্তিও নেই। আমার মত এই বৃত্তির লোকেদের ধৈর্যই হচ্ছে সাফল্যের চাবিকাঠি।

পরবর্তী এক ঘণ্টায় বিশেষ কিছু ঘটল না। তিন চারটে গাড়ি আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। ড্রাইভারেরা আমার দিকে এক নজর গকিয়ে চলে যাচ্ছে। সারাদিন খেটে-খুটে পরিশ্রান্ত হয়ে তারা বাড়ি ফিরছে। আমাকে দেখে সবাই হয়তো ভাবছে কোন বান্ধবীর জন্যে অপেক্ষা করছি। এটা আমাকে দেখে নিশ্চয়ই মনে হচ্ছিল না যে মক্কেলের বউয়ের ওপর নজর রাখতে এখানে ঘাপটি মেরে বসে আছি।

একটা মেয়ে টাইট স্ন্যাকস আর সোয়েটার পরা আমার গাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ওর সামনে লাফিয়ে লাফিয়ে একটা লোমওকুকুর এগোচ্ছিল। মেয়েটা আমার দিকে তাকাতে

আমি অবহেলা ভরে ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকালাম আর মেয়েটাও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

রাত নটার মধ্যে বেশ অন্ধকার নেমে এলো। আমি সঙ্গে আনা স্যান্ডউইচগুলো খেয়ে নিলাম। আর সঙ্গে একটা হুইস্কির বোতল ছিল। বের করে এক ঢোক গিলে নিলাম।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। এবার ক্লান্তি আসছে। এর মধ্যে ৩৩ নং বাড়িতে কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখলাম না। তবে এখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসায় নজর রাখতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। তাই গাড়ি থেকে নেমে আভে আস্তে গেটের কাছে এসে ডাবল দরজার একটা খুলে ভেতরে উঁকি মারলাম। দেখলাম কে সুন্দর একটা বাগান, দু-দিকে সুন্দর সুন্দর ফুলগাছের মধ্য দিয়ে রাস্তাটা সোজা বাংলো অবধি চলে গেছে। বাংলোর সামনে একটা সুদৃশ্য লন। বাংলোর সামনে বারান্দাটা নজরে এল।

বাংলোর ভেতরে কোন আলো জ্বলছিল না। মনে হল বাড়িতে কেউ নেই। নিশ্চিত হবার জন্যে আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে এগিয়ে গিয়ে বাংলোর পেছন দিকটাও ঘুরে এলাম। না, কোন ঘরেই আলো জ্বলছে না।

কেমন হতাশ বোধ করে আবার গাড়িতে ফিরে এলাম। মনে হয় যে মুহূর্তে কর্তা এয়ারপোর্টে গিয়েছে, গিন্নীও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। যাই হোক, রাত্রিতে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে এই আশায় গাড়িতে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি আছে?কথা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশ ডলার পাঠিয়ে দিয়েছে ভদ্রলোক। কিছু তো আমাকে করতেই হবে।

অপেক্ষা করতে করতে রাত তিনটে নাগাদ আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরের সূর্যের আলো কাঁচের ভেতরে দিয়ে চোখে এসেপড়তেই ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ভাবলাম ইস্! অন্ততঃ তিনটে ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম। এ সময়টায় আমার আরো সজাগ থাকা উচিৎ ছিল।

রাস্তায় নেমে এসে দেখলাম, একটা দুধের ভ্যান থেকে বোতলে ভরা দুধ নিয়ে বাড়ি বাড়ি দিচ্ছে। দেখলাম লোকটা ৩৩ নং বাড়ি ছাড়িয়ে আমার উল্টোদিকে ৩৫ নং বাড়িতে ঢুকল।

লোকটা বেরিয়ে এলে আমি ওর পাশে পাশে চলতে লাগলাম। লোকটার বেশ বয়স হয়েছে। ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার সারা শরীরটা দেখল। হাতে তারের জাল দিয়ে তৈরী দুধের বোতল রাখার ঝুড়িটা ঝুলিয়ে একটু হেঁটে আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো।

তুমি ৩৩ নং বাংলোতে দুধ দিতে ভুলে গেছ। আমি বললাম।

–ওরা এখানে কেউ নেই। কী ব্যাপার? ওদের ব্যাপারে খুব আগ্রহ দেখছি। কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ও জবাব দিল।

লোকটার কথাবার্তার কায়দা শুনেই বুঝলাম, একে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে কথা বার করা যাবে না। তাই পকেট থেকে আমার কার্ডটা বার করে ওর হাতে দিলাম। কার্ডটা উল্টে-পাল্টে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটু হেসে কার্ডটা ফেরত দিল।

–৩৩ নং বাড়ির লোকজন সম্বন্ধে তুমি কিছু জান?

জানি বৈকি। কিন্তু ওরা মাসখানেকের জন্যে বাইরে গেছে।

–ওরা কারা?

মিঃ এবং মিসেস মায়ার।

–কিন্তু আমি জানি এই বাংলোতে এখন মিঃ এবং মিসেস হার্ডউইক থাকে।

লোকটা ঝুড়িটা মাটিতে রেখে হাত দিয়ে টুপিটা পেছনে হেলিয়ে বলল, এখন এই বাড়িতে কেউ থাকেনা স্যার। আমি একাই এখানকার সব বাড়িতে দুধদিই। এই মাসে আমি ৩৩নং বাড়িতে দুধ দিচ্ছি না কারণ বাড়িতে কেউ নেই।

–তাই নাকি? আচ্ছা মিঃ এবং মিসেস মায়ার অন্য কাউকে বাড়িটা ভাড়া দিয়ে যাননি তো?

-আমি আট বছর ধরে এই মায়ার পরিবারকে দুধ দিচ্ছি। আজ পর্যন্ত ওরা কাউকে এই বাড়ি ভাড়া দেয়নি। আর প্রত্যেক বছরের এই মাসটায় ওরা বাইরে থাকে বলে জানি। লোকটা দুধের বুড়ি তুলে নিয়ে ভ্যানের দিকে পা বাড়ায়।

তুমি এই এলাকায় জন হার্ডউইক বলে কাউকে চেনো না?

না স্যার, আমি এই এলাকার প্রত্যেককে চিনি। জন হার্ডউইক বলে কাউকে চিনি না। এই কথা বলে লোকটা দ্রুত পায়ে ভ্যানের দিকে গেল আর গাড়িটাকে ৩৭ নং বাড়ির সামনে এনে দাঁড় করাল।

বাড়ির নম্বরটা আমি ঠিক শুনেছি তো? হ্যাঁ! ভুল তো হবার নয়। কারণ হার্ডউইকের পাঠানো চিরকূটেও তো এই একই নম্বর লেখা ছিল।

৩৩ নং বাড়ির একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। ভোরের আলো সারা বাংলোতে আবছা ছড়িয়ে পড়েছে। রাতের অন্ধকারে স্পষ্টসবকিছু দেখতে পাইনি।দরজা জানলা সাটার সমেত বন্ধ। প্রাণের স্পন্দন এখানে পেলাম না।

হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটা চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেল! আহা এই রহস্যময় হার্ডউইক কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাকে তিনশো ডলার দিয়ে অফিস থেকে বের করে আমাকে বুনো হাঁসের পেছনে ছোটাল!আমাকে ভয় পাবার মতো, এতখানি গুরুত্ব দেবার মতোরহস্য-সন্ধানী আমিনই।

যাই হোক এখন আমার দাড়ি কামানো, স্নান করা বা ঝিমুনিভাব কাটানোর জন্যে এক কাপ কফি খেতে অফিস যাওয়া ভীষণ ভীষণ জরুরী।

ছুটে গিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। পাহাড়ী রাস্তা ফাঁকা থাকায় সাতটার মধ্যে অফিসে পৌঁছে গেলাম। লবির সামনে দারোয়ানটা আমার দিকে একটা নীরস চাহনি ছুঁড়ে দিয়ে সরে গিয়ে ব্যাট দিতে লাগল। এই লোকটা কাউকেই পছন্দ করেনা। নিজেকেও নয়।

পাঁচতলায় পৌঁছে দ্রুত পায়ে আমার পরিচিত ঘরের সামনে এসে পৌঁছলাম। দেওয়ালের ফলকে লেখাঃ

নেলসন রায়ান–অনুসন্ধানকারী। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলতে যাব, হাতলে হাত দিয়ে বুঝলাম দরজা খোলা। একটু ঠেলা দিলাম, দরজা খুলে গেল। আমার মূল অফিস ঘরের বাইরের ঘর এটা। দর্শনার্থীদের বসার জন্য কয়েকটা মোটামুটি সুন্দর চেয়ার, ছোট একটা টেবিলে কয়েকটা ম্যাগাজিন, মেঝেতে এক চিলতে কাপেট দেখলেই মনে হবে কাউকে প্রবেশের জন্যে সব সময় আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

দেখলাম, ভেতরের ঘরের দরজা হাট করে খোলা, অথচ এটাও আমি কাল চাবি দিয়ে দিয়েছিলাম।

হঠাৎ দেখি, আমার মক্কেলের চেয়ারে খুব মিষ্টি একটা চীনা মেয়ে বসে আছে। হাত দুটো ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখা। পরনে সবুজ ও সাদা ফ্রক। সুন্দর পা দুটা অনাবৃত চোখ দুটো শান্ত, নিশ্চল। বাঁ-ভনের ঠিক নীচে সরু একটা রক্তের ধারা নেমে গেছে। দেখে মনে হল খুব কাছ থেকে, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ওকে গুলি করা হয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় মেয়েটা সামান্যতম আতঙ্কিত হবারও সুযোগ পায়নি।

জলে ভেসে যাবার মতো আলতো পায়ে ঘরে এসে ঢুকলাম। মুখটা স্পর্শ করে দেখি ঠাণ্ডা; বেশ কয়েকঘন্টা আগে মারা গেছে।

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে পুলিশকে একটা টেলিফোন করতে এগিয়ে গেলাম ফোনের দিকে। রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরালাম।

.

১.২

পুলিসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমি আমার এই এশীয় আগুন্তুককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। এক নজরে দেখে মনে হল মেয়েটার বয়স তেইশ-চব্বিশ এবং বেশ পয়সাওলা ঘরের মেয়ে। জামাকাপড় গুলো বেশ দামী, জুতোটা একেবারে নতুন। শরীরে একটা চেকনাই আছে। হাতের নখগুলো সযত্নে লালিত, চুলগুলো ভারী সুন্দর আর পরিপাটি। মেয়েটার সঙ্গে কোন ভ্যানিটি ব্যাগ বা এ ধরনের কিছু না থাকায় ওর পরিচয় পাবার কোন উপায় ছিল না। আমার মনে হয় হত্যাকারী ওটা নিয়ে গেছে। এরকম একটা মেয়ে হ্যান্ডব্যাগ ছাড়া বাইরে বেরিয়েছে, এটা ভাবা যায়?

না। ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে মনে হল, কস্মিনকালেও একে কোথাও দেখিনি। পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে না করতেই সিঁড়িতে একসঙ্গে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। মনে হল, একদলা চিনির ওপর এক ঝাক পিঁপড়ে ছুটে আসছে।

সবশেষে ঘরে ঢুকল ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের লেফটেন্যান্ট ড্যান রেটনিক। গত চার বছরে লোকটার সঙ্গে আমার বেশ কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। সারা শরীরে ধূর্ততা মাখা, ছোটখাট রোগা চেহারা। লোকটার আজ এই পদে উন্নতির পেছনের কারণ, ও এই শহরের মেয়রের শালা। এক পুলিশ অফিসারের পদে লোকটা একেবারেই বেখাপ্পা। তবে ওর ভাগ্য ভাল, এই শহরে ও আসার পর থেকে বড় রকমের কোন অপরাধ ঘটেনি। সম্ভবতঃ ওর আমলে এটাই প্রথম খুনের কেস।

একটা কথা এর সম্বন্ধে আমার বলা উচিত। ওর মাথায় বাচ্চাদের ক্রস ওয়ার্ড-পাজল সমাধান করার মত বুদ্ধি না থাকলেও ঠাটেবাটে একেবারে পাক্কা পুলিশ অফিসার। এখন এমনভাবে ঘরে এসে ঢুকল যেন সব কিছু পায়ে মাড়িয়ে একটা সামান্য কেস দেখতে আসছে। সঙ্গে সার্জেন্ট পুলস্কি।

সার্জেন্ট পুলস্কি মোটাসোটা লালচে চেহারার। ছোট ছোট চোখ। হাতের মোটা পাতা দুটোকে ও সব সময় মোচড়ায়–যেন যাকেই সামনে পাবে তার চোয়ালটা হাত দিয়ে মুচড়ে ভেঙে দেবে। বুদ্ধিসুদ্ধিও ভোতা। তবে পেশীশক্তি দিয়ে সেই ঘাটতিটা পুষিয়ে নেয়।

দুজনের কেউ আমার দিকে তাকাল না। মৃত দেহটার দিকে এগিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ ধরে সেটা দেখলো তারপর পুলস্কি হাঁটু মুড়ে বসে মৃতদেহটার পাশে কিছু পরীক্ষা করল। আমি রেটনিককে নিয়ে বাইরের ঘরে এলাম।

ওকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। আমার ডেস্কের ওপর বসে পা দুটো দোলাতে দোলাতে বলল, আচ্ছা বলতো মেয়েটা কি তোমার কোন মক্কেল।

-না, মেয়েটাকে আমি চিনি না তোমরা এখন যেমন দেখছ, আমিও সকালে ঘরে ঢুকে ঐরকমই দেখেছি।

হু, নিভে যাওয়া চুরুটটা দাঁত দিয়ে চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি রোজই এত সকালে অফিস খোল?

তখন আমি কোন কিছু গোপন না করে, গতরাত্রের সমস্ত ঘটনা বললাম। পুলস্কিও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে আমার সমস্ত কথা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুনল।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমি বাংলো ফাঁকা দেখেই এখানে ফিরে এসেছি। আমার মনে হয়েছিল কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু ঠিক এরকমটা হবে আশা করিনি।

–ওর হাত ব্যাগটা কোথায়? রেটনিক প্রশ্ন করল।

জানি না। আপনারা আসার আগে আমিও ব্যাগটা চারিদিকে খুঁজেছিলাম, আমারও মনে হয় ওর সঙ্গে কোন ব্যাগ ছিল। তবে আমার অনুমান হত্যাকারীরা ব্যাগটা নিয়ে গেছে।

রেটনিক আমার দিকে তাকাল। তারপর নিভে যাওয়া চুরুটটা দুবার কপালে ঠুকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, ওর সঙ্গে কী এমন ছিল, যার জন্যে ওকে খুন করতে হল?

এই হল রেটনিক। কত সহজে, তাড়াতড়ি এই সরল সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো। আমি পুলিশকে ফোন করার সময়েই ভেবেছিলাম যে প্রথম সন্দেহটা আমার ওপরই পড়বে।

–যদি ওর সঙ্গে কোহিনূর হীরেও থাকত তবু আমি এমন বুছুনই যে ওকে এখানে খুন করব। খুব ধীরে ধীরে বললাম, ও যেখানে থাকে, আমি সেই জায়গা খুঁজে বের করে সেখানেই ওকে...।

আচ্ছা। ঠিক আছে, তবে আমাকে বোঝাও ও এখানে কি করতে এসেছিল আর দরজায় তালা লাগানো সত্ত্বেও ও ঘরে ঢুকল কী করে?

-ঠিক বলতে পারবো না, তবে খানিকটা আন্দাজ করতে পারি।

–বেশ, বলল তোমার আন্দাজটা?

–আমার মনে হয় মেয়েটার আমার সঙ্গে কোন দরকার ছিল। জন হার্ডউইক নামের সেই লোকটা, অবশ্য জানি না ওটা ওর আসল নাম কিনা আমার সঙ্গে মেয়েটার দেখা যোক এটা চায়নি। এটা আমি জানিনা ও কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। এটা আমার ধারণা মাত্র।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম; হার্ডউইক আমাকে একটা ফলস ফোন করে একটা খালি বাংলো পাহারা দিতে পাঠিয়ে নিশ্চিত ছিল যে আমি ঐ সময় অফিসে থাকবোনা। ঠিক ঐ সময়েই মেয়েটা আমার চেম্বারে আসবে। ইতিমধ্যে ও আমার চেম্বারে ডেস্কের ওপরবসেরইল।আর আমার তালাগুলোর কোন বিশেষত্ব নেই। সাধারণ বাজারে ও-গুলো কিনতে পাওয়া যায় কাজেই ওর তালা খুলতে কোন অসুবিধাই হয়নি। মেয়েটার চোখে মুখে আতঙ্কের কোন চিহ্ন নেই দেখে আমার মনে হয় ও নোকটাকে চিনত না। ভেবেছে আমিই বসে আছি। আর তারপর মেয়েটা এসে বসে ওর সব কথা বলেছে। আর তখন লোকটা কাছ থেকে খুব দক্ষতার সঙ্গে ওকে গুলি করেছে। এত তাড়াতাড়ি সেটা ঘটেছে যে ওর মুখে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

রেটনিক পুলস্কিকে বলল, খুব সাবধানে থেকে পুলস্কি। এর যা মাথা তাতে তোমাদের আর খুব বেশিদিন করে খেতে হবেনা। পুলস্কি দাঁত থেকে কিছু খুঁটে বের করে আমার গালিচার ওপর থু থু করে ফেলছিল। ও কোন মন্তব্য করল না। চুপ করে থাকা ওর কাজ আর এ ব্যাপারে ও একজন পেশাদারী শ্রোতা।

রেটনিক কিছুক্ষণ চিন্তকাল। তারপর বলল, তোমার এই ধারণাগুলো যে আজগুবি তা তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। ঐ লোকটা তোমাকে এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করেছিল। ঠিক ত? এয়ারপোর্ট এখান থেকে প্রায় মাইল ছয়েক দূরে। তুমি যদি সত্যিই বলে থাকে, তবে তোমার কথা অনুযায়ী তুমি ছটার পর অফিস থেকে বেরিয়েছে। এবার তুমি তো জানো বিকেলে ঐ রাস্তায় ট্রাফিকের যা অবস্থা তাতে ও কিছুতেই তোমার অফিসে সাড়ে সাতটার আগে পৌঁছতে পারে না। আর মেয়েটিও জানত বিকেলে তোমার ওখানে পৌঁছনো অনেক সময়ের ব্যাপার, সুতরাং ও তোমাকে একটা টেলিফোন না করে আসবেই না।

–ও যে টেলিফোন না করে এসেছে এটা কে জানে? হয়ত হার্ডউইক সেই সময় আমার অফিসে চলে এসেছে, আর আমি সেজে ওকে বলেছে, আমার এখানে সোজা চলে এসো।

ব্যাপারটা যে এরকমও হতে পারে এটা চিন্তা করে চুরুট কামড়াতে কামড়াতে গুম হয়ে রইল রেটনিক।

এমন সময় একজন মেডিক্যাল অফিসার, দুজন শববাহী হাতে স্ট্রেচার নিয়ে দরজায় উঁকি দিল।

রোগা, ফ্যাকাশে মুখের মেডিক্যাল অফিসার মৃতদেহ পরীক্ষা করার জন্যে তার লোকজন নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

রেটনিক তার হীরের টাই-পিন ঠিক করতে করতে বলল, ঠিক আছে মেয়েটা একে হলদে চামড়া, তায় সুন্দরী সুতরাং কারোরই চোখ এড়াতে পারেনি, ওর-খোঁজখবর ঠিক পেয়ে যাব। আর ঐ লোকটার কি নাম হার্ডউইক, ও তোমার সঙ্গে কবে দেখা করবে বলেছিল?

আগামীকাল, শুক্রবার।

-তোমার কি মনে হয় ও দেখা করবে?

সম্ভাবনা কম।

–হু, মাথা নাড়ল রেটনিক, তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঘোঁৎ করে উঠল, তোমার চেহারা তো দেখছি ঝোড়ো কাকের মতো? যাও কফি-টফি খেয়ে এসো। আর শোন! কারোর সঙ্গে এ ব্যাপারে বেশি কথা বলবে না। আমি আধঘণ্টা পরে আবার তোমার সঙ্গে বসব।

–হ্যাঁ, একটু কফি খাবো, আর বাড়ি গিয়ে একটু স্নান করবো।

–না, তোমার আর কোথাও যাওয়া চলবে না, শুধু কফি খেয়ে চলে আসবে।

আমি লিফটে নীচে নেমে তাড়াতাড়ি কুইক-ম্যাক্স বার-এর দিকে এগোলাম। এখন সকাল আটটা বাজে কুড়ি। অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিসের গাড়ি ঘিরে জিজ্ঞাসু মানুষের ভিড়।

আমি বুঝলাম পুলিশ প্রহরায় আমাকে কফি খেতে হবে।

আমাকে দেখেই বার-এর স্প্যারো উদ্বিগ্নভাবে এগিয়ে এলো আপনার ওখানে কি হয়েছে মিঃ রায়ান। চাপা হিসহিসে গলায় ও জিজ্ঞেস করল।

-খুব তাড়াতাড়ি এক কাপ কালো কফি কড়া করে বানাও আর হ্যাঁমের ওপর দুটো ডিম ফেলে ভেজে দাও। বারের বাইরে দরজার কাছে দুটো সাদা পোষাকের পুলিশ দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

স্প্যারো আর কথা না বাড়িয়ে নিজের মনে প্রশ্নগুলোকে চাপা দিয়ে কফি তৈরী করতে লাগল।

ডিম ভাঙতে ভাঙতে আমার দিকে তাকিয়ে দোনামোনা করতে করতে জিজ্ঞাসা করলো, ওখানে কি কেউ মারা গেছে মিঃ রায়ান?

বাইরে অপেক্ষমান পুলিশটাকে নজরে রেখে জিজ্ঞেস করি, তুমি রাত্রে কটার সময় দোকান বন্ধ কর স্প্যারো?

–ঠিক দশটায়। এবার কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে ও জিজ্ঞেস করল রাস্তার ওখানে কি হচ্ছে বললেন না তো?

–একটা চীনা মেয়ে খুন হয়েছে। কফিতে চুমুক দিলাম। সত্যি কফিটা স্প্যারো দারুণ বানিয়েছে। খুব গরম আর কড়া। আবার বললাম, আর সেটা আমার অফিসের মধ্যেই। আধঘণ্টা আগে দেখে এসেছি।

উত্তেজনায় ওর কণ্ঠনালী লাফাতে লাগল।

–সত্যি বলছেন, খুন?

–ভগবানের দিব্যি। আর এক কাপ কফি দাও। আগের কাপটা এগিয়ে দিলাম।

–একটা চীনা মেয়ে? এরকম একটা খুনের ঘটনা শুনে ও রীতিমত উত্তেজিত।

–হ্যাঁ, এর বেশি কিছু প্রশ্ন কর না। এছাড়া তুমি যা জান আমিও তাই জানি। আচ্ছা, কাল আমি যাবার পর কোন চীনা মেয়েকে আমার অফিস ব্লকে ঢুকতে দেখেছো?

কাপে কফি ঢালতে ঢালতে মাথা নেড়ে ও বলল, কাল সন্ধ্যার পর দোকানে একদমই ভিড় ছিল না। আমি দোকান বন্ধ করার আগে কেউ ঢুকলে অবশ্যই দেখতে পেতাম।

এবার আমি অল্প অল্প ঘামতে লাগলাম। রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত আমার একটা অ্যালিবাই আছে। যখন ঐ মেয়েটা কুকুর নিয়ে আমার গাড়ির পাশ দিয়ে গেছে, মনে হয়

তখনই মেয়েটা আমার অফিসে ঢুকেছে। তারপর থেকে আমি একা সেইমিঃ মায়ারের খালি বাড়ি পাহারা দিয়েছি।

–আচ্ছা আমি তোমার দোকানে খেয়ে যাওয়ার পর থেকে তোমার দোকান বন্ধ করা পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে অপরিচিত কাউকে আমার অফিস বাড়িতে ঢুকতে দেখেছো?

-না সেরকম কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। দারোয়ান অন্য দিনের মতো নটায়। তালা লাগিয়ে দিয়েছে। আমাকে হ্যাম দিতে দিতে ও জিজ্ঞেস করল, কে মেরেছে ওকে?

জানি না। হঠাৎ আমার ক্ষিদের ইচ্ছেটা একদম চলে গেল। ঘটনার ছবি এখন পর্যন্ত যা, তাতে রেটনিকের মাথাকে সে ভাবে সব ব্যাপার পরিষ্কার করে না দিলে ও আমার পেছনে লেগে থাকবে। আমি বললাম, আমার মনে হয় এই পথ দিয়ে মেয়েটা কাল ঠিকই গেছে, তুমি খেয়াল করনি।

–তা অবশ্য হতেও পারে। আমি তো জানলার দিকে সবসময় তাকিয়ে বসে থাকিনা।

দুটো লোক চুকে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে স্প্যারোকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে ওখানে?

স্প্যারো জবাব দিলো, জানি না।

দুজনের মধ্যে একজন মোটা, গায়ে ব্রান্ডো জ্যাকেট, সে বলল, কাকে যেন একেবারে ঝেড়ে দিয়েছে। সে জন্যই তো ঐ অ্যাম্বুলেন্স, দেখলে না?

–ক্ষিদের ইচ্ছেটা চলে যাওয়ায় খাবারের প্লেটটা সরিয়ে উঠে পড়লাম।

দরজা দিয়ে বেরোতেই পাহারারত পুলিশটা আমার পিছু নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায়, যাওয়া হচ্ছে?

–তাচ্ছিল্য ভরে জবাব দিলাম, অফিসে, কেন? তোমার কি তাতে অসুবিধে আছে?

যতক্ষণ না লেফটেন্যান্ট আপনাকে ডাকছেন, ততক্ষণ আপনি ঐ গাড়িটায় গিয়ে বসুন। বুঝলাম তর্ক করে লাভ নেই। সামনের একটা পুলিসের গাড়ির পিছনের সীটে গিয়ে বসলাম। কৌতূহলী এক দঙ্গল লোক আমাকে দেখতে এসে ভিড় জমাতে লাগল। আমি ওদের উপস্থিতি অবজ্ঞা করতে একটা সিগারেট ধরালাম।

সিগারেট খেতে খেতে আমি ঘটনার পূর্বাপর চিন্তা করতে লাগলাম। বুঝলাম বেশ প্ল্যান করেই আমাকে ফাঁসানো হয়েছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে স্ট্রেচারে মেয়েটাকে নামিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

মনে হল, একটা ছোট মেয়ে ঘুমিয়ে আছে আর ভিড়ের লোকজন যথারীতি ইস্, আঃ– এই সব দুঃখসূচক শব্দগুলো করতে লাগলো।

মেডিক্যাল অফিসার ভদ্রলোক নেমে এলেন এবং নিজের গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন।

খানিক পরে ওপরের এক দঙ্গল পুলিশ নেমে এল।ওদের মধ্যে একজন আমার পাহারাদারকে ইশারায় কি যেন বলল। সব পুলিশই বার গাড়িতে উঠে ওদের গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

এবার নেমে আসুন, আপনাকে ডাকছে। পাহারারত পুলিশটা বলল।

আমি নেমে রাস্তা পার হচ্ছি তখন মিঃ ওয়েডে সেই ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট ভদ্রলোক, তিনি তার গাড়ি থেকে নেমে আমার সঙ্গে লিফটে উঠলেন।

ভদ্রলোকের বয়স আমার চেয়ে চার বছর কম হবে। অ্যাথলিটদের মতো বড় সড় চেহারা, ক্ষিপ্র, স্মার্ট। স্ক্রু কাট চুল, রোদে পোড়া চামড়া। লিফটে উঠতে উঠতে খুব কম সময়ের মধ্যে

অঙ্গ কথা হয়।

আমি একেও রং-চড়িয়ে বেশ দুঃসাহসিক দু-একটা কাহিনী শুনিয়েছি এবং সেগুলোও বেশ উপভোগ করেছে। আমার এই বৃত্তি সম্বন্ধে ইনিও বেশ আগ্রহী।

–ওপরে কি হচ্ছে? লিফট মাটি ছেড়ে পাঁচ তলায় ওঠার সময় ও জিজ্ঞেস করল।

-সকালে অফিসে গিয়ে দেখি আমার ঘরে একটা চীনা মেয়ের মৃতদেহ! পুলিশ তাই এই ব্যাপারে খুব উত্তেজিত।

–মৃতদেহ? ভদ্রলোকের ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন।

–হ্যাঁ, মনে হয় কেউ গুলি করেছে।

খবরটায় ভদ্রলোক চমকে গেলেন–গুলি করেছে? তার মানে খুনের কেস?

–তাইতো মনে হয়। ফ্যাকাশে হাসি হেসে বললাম।

হু, কে মারল বলুন তো?

–সেটাই তো কথা। কাল রাত্তিরে আপনি কটার সময় দোকান বন্ধ করেছেন? আমি যখন বেরোই তখনও কি আপনি অফিসে ছিলেন?

–এই ন-টা নাগাদ দারোয়ান এসে বন্ধ করে দিল আর আমিও তখন চলে গেলাম।

ঐ সময়ের মধ্যে কোন গুলির আওয়াজ পাননি?

না, ভগবানের দিব্যি!

–আচ্ছা, যখন আপনি বেরোলেন অফিস থেকে, তখন কি আমার ঘরে কোন আলো জ্বলছিল?

না তো, আপনি তো কাল ছটায় চলে গেলেন?

হু

তাহলে মনে হচ্ছে মেয়েটাকে রাত নটার পর খুন করা হয়েছে, সুতরাং আমার অ্যালিবাই তো এখন ভিজে মুরগীর চেয়েও দুর্বল।

লিফট এসে থামল। সেই সময় সার্জেন্ট পুলস্কি আর দারোয়ানটা আমার অফিস থেকে বেরিয়ে এল। দারোয়ানটা আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন চোখের সামনে একটা দু মাথাওলা রাক্ষস দেখছে। ওরা আমাকে পাশ কাটিয়ে লিফটে উঠে নেমে গেল।

আমার মনে হয় এখন আপনাকে বেশ ব্যস্ত থাকতে হবে। ঠিক আছে, যদি কোন প্রয়োজন হয় ডাকনে।

ধন্যবাদ, নিশ্চয়ই ডাকবো।

আমার অফিসের দরজার কাছে পুলিশ দাঁড়িয়ে। তাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলাম।

লেঃ রেটনিক ডেস্কের পিছনে আমার চেয়ারে বসে। আমার দিকে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে মক্কেলদের জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারে ইশারা করে বসতে বললেন।

ঐ চেয়ারটাতেই মেয়েটা বসেছিল। খুব হাল্কা রক্তের দাগ দেখে আমি চেয়ারে না বসে হাতলটায় বসলাম।

–তোমার বন্দুকের পারমিট আছে? রেটনিক প্রশ্ন করল।

–আছে।

কী বন্দুক?

–একটা পয়েন্ট থ্রী-এইট পুলিশ স্পেশাল।

দাও। হাত বাড়াল।

–ডান দিকের ড্রয়ারের ওপরের ধাপে আছে।

আমার দিকে তাকিয়ে থেকে খানিকক্ষণ পর বলল,না নেই। আমি তোমার সারা ড্রয়ার খুঁজে দেখেছি।

আমার ঘাড় দিয়ে ঠাণ্ডা ঘাম শিরশির করে নামছে। কোনমতে নিজেকে ঠিক করে বললাম, ওখানেই তো থাকার কথা।

রেটনিক তার শুয়োরের চামড়ায় বাঁধানো সিগারেট কেস থেকে একটা চুরুট বের করে জ্বালিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটা মৃদু টান মেরে বলল, মেয়েটাকে পয়েন্ট থ্রী এইট দিয়েই মারা হয়েছে আর মেডিকেল অফিসারের অভিমত অনুযায়ী সেটা ঘটেছে আজ ভোর তিনটে নাগাদ। রায়ান, সত্যি বলে ফেল। কেন শুধু শুধু জল ঘোলা করছ?বল মেয়েটার ব্যাগে কী ছিল? মেজাজ এবং গলা ঠাণ্ডা রেখে বললাম, মিঃ রেটনিক আমাকে দেখে এতটা বুদ্ধ মনে হয় জানি না। তবে মেয়েটার ব্যাগে কুবেরের ধন থাকলেও আমি তাকে আমার মক্কেলের চেয়ারে বসিয়ে খুন করে, আপনাদের খবর দোব অতটা গবেট আমি নই।

জানিনা। হয়ত তুমি জুৎসই একটাঅ্যালিবাই তৈরী করে তারপরেই এই কাজে নেমেছে।

আর যদি আমিই ওকে খুন করতাম তবে আমার অ্যালিবাইটা রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত রাখতাম না। ভোর তিনটে পর্যন্তই করে রাখতাম। আপনাকে তো কালরাত্তিরে আমি কী করেছি সব বিস্তারিত জানিয়েছি।

রেটনিক নিজের বুদ্ধিতে শান দেওয়ার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার চারপাশে গোমড়া মুখে পায়চারী করতে লাগল।

–ভোর তিনটের সময় ঐ মেয়েটা তোমার এখানে কি করছিল?

–তাহলে আমাকে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বলতে হয়।

–দেখ রায়ান, খানিক উত্তেজিত অথচ অন্তরঙ্গ গলায় রেটনিক বলল, আমাদের শহরে গত পাঁচ বছরে কোন খুনের কেস পাইনি। এখন সাংবাদিকরা এই ঘটনায় ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের দেবার মত বিশ্বাসযোগ্য গল্প তো আমার চাই।ঠিক আছে তুমি অনুমান করে কি বলবে বলছিলে বল, আমি শুনব। আমার কাছে এখন পর্যন্ত যা সাক্ষ্য প্রমাণ আছে তাতে তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারি। কিন্তু তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি, তুমি প্রমাণ কর আমার ধারণা ভুল। বল, কি বলবে।

ধরা যাক, মেয়েটা সানফ্রান্সিসকো থেকে এসেছে এবং এটাও ধরে নেওয়া যাক যে ওর খুব জরুরী কিছু আমাকে বলার ছিল। হয়তো বলবেন, সানফান্সিসকোতে কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভের সঙ্গে কথা বলতে পারত। পারতো, কিন্তু ধরে নিন আমার এখানেই

আসছিল এবং ঠিক ছিল কাল রাত সাতটা নাগাদ প্লেনে করে ও চলে আসবে। তখন আমি থাকব কিনা এই ভেবে হয়তো ও ওখান থেকেই একটা ফোন করল। আর আমাকে তাড়িয়ে হার্ডউইক আমার চেয়ার থেকে ফোন ধরল। ফোনে মেয়েটা জানাল যে ও প্লেনে রাত তিনটের সময় আসছে। হার্ডউইক জানাল যে ও যেন সোজাসুজি অফিসে চলে আসে। ও অপেক্ষা করবে।

মেয়েটা এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি ধরে সোজা এসে হার্ডউইককে আমি মনে করে সব কথা খুলে বলল। ও সেগুলো শুনল এবং গুলি করল।

–তোমার বন্দুক দিয়ে?

–হ্যাঁ, আমার বন্দুক দিয়ে।

–এই বাড়ীর প্রবেশ দ্বার নটায় বন্ধ হয়, তাছাড়া দরজার তালাও ভাঙা হয়নি। হার্ডউইক। বা মেয়েটা ঢুকল কিভাবে?

–আমি অফিস ছাড়ার পরে এবং দারোয়ান দরজা বন্ধ করার আগেই হার্ডউইক ঢুকে পড়ে। মেয়েটা আসার সময় নীচে নেমে দরজার ইয়েল লকখুলে ওকে ঢুকিয়ে নিয়েছে। এই লক ভেতর থেকে খুলতে কোন অসুবিধাই হয়নি।

–সিনেমার জন্য গল্প লিখো, কাজ হবে, তেতো হাসি হেসে রেটনিক বলল। তুমি কি জুরীদের সামনে এই গল্প বলবে?

–অবশ্যই। আমার ধারণাটা যাচাই করতে হলে এয়ারপোর্টের ট্যাক্সিওয়ালাদের কাছে খোঁজ নিলেই ব্যাপারটা জানা যাবে।

–ঠিক আছে, ধরে নিলাম তুমি যা যা বললে সব ঠিক। শুধু ঐ বানানো হার্ডউইকের জায়গায় তুমি...। ধূর্ত হাসি হেসে রেটনিক বলল।

–মিঃ হার্ডউইক যে বানানো কোন লোক নয়, এটা আপনি এক্সপ্রেস মেসেঞ্জার সার্ভিস এ খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। রাত্রে ওদের মাধ্যমে আমি তিনশ ডলার পাই। আর সে রাতে সাড়ে সাতটা থেকেনটা পর্যন্ত ৩৩নংকন বুলেভার্ডের বাইরে অপেক্ষা করছিলাম সেটাও খোঁজ নিন। রাত দুটো নাগাদ একটা গাড়ি যায়, জানি না ড্রাইভার আমাকে লক্ষ্য করেছে কিনা। তবে সকাল ছটায় দুধওলা লোকটার সঙ্গে আমার কথাও হয়েছে।

–আমি শুধু জানতে চাই রাত একটা থেকে আজ ভোর চারটে অবধি তুমি কোথায় ছিলে?

–৩৩ নং বুলেভার্ড রোডের বাড়ির সামনে।

রেটনিক কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, দেখি তোমার পকেটগুলো।

আমি কোন কথা না বলে পকেট উল্টে যা ছিল বের করে দিলাম। রেটনিক যখন আগ্রহভরে সেগুলো দেখছে, বললাম, মেয়েটার থেকে কিছু নিয়ে থাকলে সেটা পকেটে নিয়ে বেড়াতাম না।

উঠে দাঁড়াল রেটনিক। বলল, শহর ছেড়ে কোথাও যাবে না। আমি আরও কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করে তোমায় দেখব। গটগট করে চলে গেল ও।

টেবিল থেকে জিনিষগুলো তুলে পকেটে রেখে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার বিরুদ্ধে একটা জোরালো কে সাজাতে রেটনিককে আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নতুন সূত্র বার করতে হবে। আমার মনে হচ্ছে প্রকৃত খুনী এই কেসটায় আমাকে ভাল করে জড়াতে চাইছে। আমার বন্দুক হাওয়া হয়ে যাবার একটাই কারণ, ওটা খুনী এমন জায়গায় রেখে দিয়েছে যেটা রেটনিকের হাতে পড়বে আর আমার ওপর আরও বেশী সন্দিহান হয়ে উঠবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। নাঃ অনেক কাজ আছে। এভাবে সময় নষ্ট করা ঠিক হবেনা।

অফিসের দরজা বন্ধ করে লিফটের দিকে এগোতে দেখলাম, রেটানিক মিঃ ওয়েডের সামনে বসে আছে। অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে আরো সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। চুলোয় যাক্।

নীচে নেমে দুটো পুলিশকে পেরিয়ে রাস্তায় নেমে গাড়ীতে উঠে বসলাম।

আমার মধ্যে উত্তেজনা এবং ভয় দুটোই কাজ করছে। হঠাৎ এক ঢোক হুইস্কির জন্যে তেষ্টা অনুভব করলাম। সাধারণতঃ সন্ধ্যে ছটার আগে আমি ড্রিংক করি না। কিন্তু আজকের দিনটা ব্যতিক্রম। সামান্য ঝুঁকে সীটের সামনের খুপরী থেকে বোতলটার জন্যে

হাত বাড়ালাম। কিছু একটাতে হাত ঠেকতেই মনে হল আমার সারা শরীরের রক্ত কেউ শুষে নিয়েছে, সারা শরীর ভয়ে অবশ হয়ে এতই মনে হল আমার পরী থেকে বোতলকা

খুপরীর মধ্যে আমার পয়েন্ট থ্রী-এইটটা আর একটা টিকটিকি চামড়া রং-এর হাতব্যাগ।

বিহ্বল হয়ে বসে রইলাম। মাথার চিন্তাগুলো সব এলেমেলো হয়ে গেল। কোন সন্দেহ নেই, হাত ব্যাগটা ঐ চীনা মেয়েটারই।

.

১.৩

পুলিশ হেড কোয়ার্টারের পেছনের দিকটা আট ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এখানে পুলিসের টহলদারী গাড়ি, রায়ট স্কোয়াড ট্রাক এবং খুব জরুরীকাজের জন্য দ্রুতগামী গাড়িগুলিমজুদ থাকে।

দেওয়ালের একদিকে লাল অক্ষরে বড় বড় করে কতগুলো কথা লেখা আছে যার অর্থ হচ্ছে এখানে শুধুমাত্র পুলিসের গাড়ি দাঁড় করানো যাবে।

খোলা গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে আমি আস্তে আস্তে টহলদারী গাড়ির পাশে গাড়িটা দাঁড় করালাম।নামতে যাচ্ছি এমন সময় একটা লালমুখো আইরিশ বাজখাই গলায় চীৎকার করে বলল,– এখানে কি লেখা আছে পড়তে জানো না? কি ব্যাপার, আঁ?

–কোন ব্যাপারই নয় আর পড়তেও জানি।

ও আমাকে কিভাবে আক্রমণ করবে ঠিক করতে মুখটা হাঁ করে রইল। ও কিছু বলার আগেই মৃদু হেসে গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললাম, ডিটেকটিভ, লেঃ রেটনিক মানে আমাদের মেয়রের শালা আমাকে এখানে গাড়ি পার্ক করতে বলেছে। ইচ্ছে হলে জিজ্ঞেস করুতে পারো, তবে যদি গালাগালি খাও তো আমাকে দোষ দিও না।

পুলিশটা ভড়কে গিয়ে আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল।

মিনিট কুড়ি গাড়িতে বসে থাকার পরে একটা গাড়ি এসে থামল। রেটনিক গাড়ি থেকে নেমে হেড কোয়ার্টারের ধূসর বাড়িটার দিকে হাঁটা লাগাল।

লেফটেন্যান্ট...।

আমি খুব আস্তে ডাকলেও শুনতে পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন এইমাত্র কেউ ওর ঘাড়ে লোহার ডাণ্ডা মেরেছে। দ্রুত পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এল।

-কি ব্যাপার, এখানে কেন?

–এই আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

–হু। কয়েক সেকেন্ড ভাল করে দেখে বলল, তা আমি তো এসে গেছি, কি বলার আছে বল।

আমি গাড়ি থেকে নামলাম।

–আপনি আমাকে খুব ভাল করে সার্চ করলেন, কিন্তু আমার গাড়িটা সার্চ করতে ভুলে গেছেন।

রেটনিক শক্ত হয়ে নাকের পাটা দুটো ফুলিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

–কেন তোমার গাড়ি সার্চ করতে যাব কেন?

–আপনি তো জানতে চাইছিলেন যে ঐ হলুদচামড়ার মেয়েটার হাতব্যাগে কি আছে যার জন্যে আমি ওকে আমার অফিসে খুন করেছি। তাই তো? তা আমি ভেবেছিলাম আমাকে সার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার গাড়িটাও সার্চ করবেন, একজন সত্যিকারের বুদ্ধিমান পুলিশ অফিসার যা করে আর কি! যাক গে। তা এখন আমি আমার গাড়িটা এনেছি আপনাকে একজন বুদ্ধিমান পুলিশ অফিসার হবার সুযোগ দেবার জন্যে।

রাগে রেটনিকের মুখ লাল হয়ে গেল।

–শোন, শুয়োরের বাচ্চা। তোমার মত ছুঁচো গোয়েন্দাদের কাছ থেকে বড় বড় বাত শুনতে চাই না। আমি পুলস্কিকে পাঠাচ্ছি। তোমাকে কী করতে হয় দেখাবে। তোমার হাড়-মাস এক করা উচিত।

তার আগে গাড়িটা একবার পরীক্ষা করলে মনে হয় ভাল হবে। এই ভেতরের কুঠুরিটা দেখুন, তাতে মনে হয় আপনার অনেক সময় বাঁচবে। গাড়ি থেকে নেমে দরজাটা খুলে দাঁড়ালাম।

ঝুঁকে পড়ে ও ভেতরের কুঠুরিটা পরীক্ষা করতে লাগল, আমি ওর প্রতিক্রিয়া উপভোগ করতে লাগলাম।

ওর চোখে মুখে যে রাগ ভাবটা ছিল সেটা চলে গেল। বন্দুক, হাতব্যাগ কোন কিছু স্পর্শ না করে, কিছুক্ষণ ধরে জিনিষ গুলো দেখলো। তারপর আমার দিকে তাকাল।

বন্দুকটা তোমার?

–হ্যাঁ।

–হাত ব্যাগটা মেয়েটার?

–সেটা বলে দিতে হবে কি?

আমাকে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। বুঝলাম বেশ ঘাবড়ে গেছে।

–ঠিক আছে। ওসব কথা ছাড়ো। চলল, তুমি যে ওকে খুন করেছে, সেটা স্বীকার করে বিবৃতি দেবে।

–আমি ত তোমাকে ব্যাপারগুলো যেভাবে ঘটেছিল, ঠিক সেভাবে বলেছি, এখন তুমি এগুলো কিভাবে নেবে তোমার ব্যাপার!

গেটের পাহারারত পুলিশটাকে রেটনিক ইশারা করে ডাকল, তারপর তাকে পুলস্কিকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলল।

ইতিমধ্যে রেটনিক মেয়েটার হাতব্যাগ আর বন্দুকটা স্পর্শ না করে বেশ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

–আমি তোমাকে দুবার বাঁচার সুযোগ দেব না, রেটনিক বলল।

গাড়িতে যেগুলো পেয়েছি, সেগুলো তোমাকে দেখাতে না আনলে নিশ্চয়ই দুবার সুযোগ নেওয়ার প্রশ্ন আসতো না। কিন্তু যেহেতু আমি এসেছি দুবার, বাঁচার সুযোগ আমাকে নিতেই হবে।

–তুমি কি সব সময় গাড়ি চাবি দিয়ে রাখ? একদৃষ্টে চেয়ে রেটনিকের প্রশ্ন। বুঝলাম ওর ব্রেন কাজ করছে।

–হ্যাঁ, তবে একটা ডুপ্লিকেট চাবি আমি বন্দুকটা যে ড্রয়ারে থাকে সেখানে রাখি, আমি যদিও খুঁজে দেখিনি, তবুও বাজি ধরে বলতে পারি ঐ চাবিটা ওখানে এখন নেই। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে গাল চুলকোতে চুলকোতে রেটনিক বলল, তোমার আন্দাজই ঠিক। আমি দেখেছি ড্রয়ারে কোন চাবি নেই।

পুলস্কি এসে দাঁড়ালো। রেটনিক বলল, এই গাড়িটা ভাল করে সার্চ কর। তবে বন্দুক আর হাতব্যাগটা সাবধানে রাখবে। তুমি বরং লেসনিকে ডেকে বন্দুকটা ওকে নজরে রাখতে বলল।

এরপর আমাকে ইশারা করতে আমরা সিঁড়ি পেরিয়ে প্যাসেজ দিয়ে এগোতে লাগলাম।

প্যাসেজের শেষে করিডোর। এখান থেকে কয়েক পা এগিয়ে মুরগীর খাঁচার মত একটা ঘর। তাতে একটা ডেস্ক, দুটো চেয়ার, একটা ফাইলিং ক্যাবিনেট আর একটা ছোট জানালা। দেখলে মনে হবে কোন অনাথ আশ্রমের কমনরুম।

ডেস্কের পেছনের চেয়ারে নিজে বসে আমাকে সামনের চেয়ারটায় বসতে বলল।

–এইটা আপনার অফিস? ভেবেছিলাম মেয়রের শালার অফিসে আরও কিছু থাকবে।

আমার অফিস নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। এখন ভাবো ঐ বন্দুকটা যদি তোমার হয় আর ব্যাগটা মেয়েটার হয়, তাহলে তোমার কি হবে! ধরে নিতে পারো তুমি মরেছ। এতে কোন ভুল নেই।

চেয়ারে আরাম করে বসতে বসতে বললাম, তাই নাকি!দেখুন প্রায় দশ মিনিট কিংবা তার বেশি সময় ধরে আমাকে প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। যদি আমি ঐ বন্দুক আর হ্যান্ডব্য সমুদ্রে ফেলে দিতাম কিংবা মাটিতে পুঁতে ফেলতাম, তাহলে লেফটেন্যান্ট, আপনার মত বুদ্ধিমান পুলিশ বাহিনীর সাধ্য হতো না ওগুলো খুঁজে বের করা। তাই আমার উদ্দেশ্যটা বুঝুন, আমি চাই এই খুনের একটা কিনারা হোক।

কী বলতে চাইছো তুমি?

আমি এগুলো লোপাট করিনি এইজন্য যে সমস্ত ব্যাপারটা সাজানো হয়েছে প্ল্যানমাফিক। গাড়ির জিনিষগুলো এইজন্য দেখালাম যে না দেখালে কেসটার কিনারা করতে আপনার অসুবিধা হবে।

–তা এই বন্দুক আর হ্যান্ড ব্যাগটা দেখে কি হলো?

–আপনি শুধু আমার দিকেই চোখটা নিবদ্ধ রাখবেন না। এগুলো থেকে আপনি কোন সূত্র পেতে পারেন। আসল খুনী তো এটাই চায় আমাকে খুনী বানিয়ে নিজে পেছন থেকে দেখবে, আপনি আমার পেছনে ধাওয়া করছেন।

রেটনিক কিছুক্ষণ ঝিম মেরে তারপর সিগারকেস থেকে চুরুট বের করে একটা আমাকে দিল। যদিও চুরুট খেতে আমার ভাল লাগেনা, তবুও আস্তে আস্তে টানতে লাগলাম।

ঠিক আছে রায়ান, আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম, ভেবেছিলাম মেয়েটাকে তুমিই মেরেছে, তাহলে আমার কাজকর্ম অনেক হালকা হয়ে যেত। এখন আর সেটা ধরা যাচ্ছে না। যাই হোক, আমি এখন আর তোমাকে খোঁচাব না।

আবার বলতে লাগল রেটনিক, তবে হ্যাঁ, শালা,বাস্টার্ড বড়সাহেবকে তো জানো, ও শালাকে বোঝানো একটা ঝামেলার ব্যাপার! হাতের কাছে জেলে ভরার মত একটা লোক থাকতে মনে হয় না ধৈর্য ধরে কিছু শুনবে বলে।

ব্যাপারটা ঠিকই, আমি চুপ করে রইলাম।

রেটনিক জানলার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা চিন্তা করছে।

-তোমাকে নিয়ে যে কি করব, তাই ভাবছি। এই বলে ফোনের দিকে হাত বাড়াল।–এজন্যে কিছু সময়ের প্রয়োজন।

টেলিফোনের অপর প্রান্তে কারোর গলা পেয়ে রেটনিক বলল, শিগগীর চলে এস, দরকার আছে।

কিছুক্ষণ পর বেশ ঝকঝকে, বুদ্ধিদীপ্ত এক যুবক ঘরে ঢুকলো।

রেটনিক আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। আমাকে দেখিয়ে বলল, এ হচ্ছে নেলসন রায়ান একটা টিকটিকি। একে আমার পরে দরকার পড়বে, তুমি একে সঙ্গ দাও। এরপর ওকে দেখিয়ে বলল, এ হচ্ছে প্যাটারসন, নতুন জয়েন করেছে। একে নষ্ট করে দিও না।

আমরা করিডোর দিয়ে কিছুটা হেঁটে একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকলাম। সারা ঘরে জীবাণুনাশক ওষুধের গন্ধ ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি জানলার ধারে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম। প্যাটারসন ডেস্কের কোণায় ঠেকা দিয়ে দাঁড়ালো।

–আরাম করে বসা যাক। আমি বললাম। এখানে হয়ত কয়েকঘণ্টা বসে থাকতে হবে আমাদের। জানেন তো আপনার বস্ আমাকে একটা চীনা মেয়ের খুনীবলে চালাতে চেষ্টা করছে, যদিও সেটা প্রমাণ করার সুযোগ নেই। চোখ কুচকে তাকালো প্যাটারসন।

ওকে একটু খোলামেলা করার জন্যে রেটনিকের আধপোড়া চুরুটটা দিয়ে বললাম, এটা মিউজিয়ামে রাখার মত জিনিষ। রেটনিকের স্টকের মাল। তোমার সংগ্রহশালার জন্যে এটা নেবে?

প্যাটারসনের মুখটা আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে আসছে, বলল, দেখুন আমরা বসদের নিয়ে এরকম...

ব্যস্ ব্যস্। ঠিক আছে। আমি তোমার বসূদের প্রতি অসম্মানজনক কিছু বলেছি, এটা স্রেফ মজা করার জন্যে।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে ও হেসে আরাম করে বসল।

লাঞ্চের সময় একটা পুলিশ আমাদের থালায় করে মাংস আর জীন দিয়ে গেল। অল্প বয়সের প্যাটারসনের খাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল ওর বেশ ভাল লেগেছে আর খিদেও পেয়েছে। আমি থালাটা নাড়াচাড়া করে ফেরৎ পাঠালাম।

এরপর প্যাটারসন এক প্যাকেট তাস বের করল। আমরা দেশলাই দিয়ে রামি খেলোম।

ওর পুরো দেশলাই বাক্স জিতে নেওয়ার পর ওকে দেখিয়ে দিলাম ওকে আমি কিভাবে ঠকাচ্ছিলাম। ওকে বেশ মনমরা দেখাল। তারপর ওকে এই খেলার চুরি বিদ্যেটা শিখিয়ে দিলাম। ও উৎসাহী ছাত্রের মত ব্যাপারটা শিখে নিল।

রাত আটটা নাগাদ সেই পুলিশটাই আবার সেই একই খাবার নিয়ে এল। এতখানি সময়ের মধ্যে এমন একটা অবসাদ এসে গেছে যে সমস্ত খাবারটা আমরা বিরক্তি কাটাবার জন্য খেয়ে নিলাম।

খাওয়ার পর আমরা আবার রামি খেলতে বসলাম। এবার প্যাটারসন আমাকে ঠকিয়ে পুরো বাক্সটাই জিতে নিল। একেই বলে গুরু মারা বিদ্যে।

মাঝরাত নাগাদ টেলিফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে প্যাটারসন ও-ধারের কথা শুনল।

তারপর বলল, হ্যাঁ স্যার।

টেলিফোন রেখে বলল, লেঃ রেটনিক আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। চলুন যাই।

আমরা এতক্ষণ বেশ কথাবার্তা বলছিলাম। কিন্তু আমরা বিচ্ছেদের আগে কথা বলা বন্ধ করেছি।

দুজনে করিডোর দিয়ে হেঁটে রেটনিকের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

রেটনিক বেশ ক্লান্ত এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। একটা চেয়ারদেখিয়ে আমাকে বসতে বলল। প্যাটারসন চলে গেল।

বেশ কিছু সময় আমরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

–তুমি খুব ভাগ্যবান লোক,বুঝলে রায়ান। আমি মনে করিনা খুনটা তুমি করেছে কিন্তু আমি নিশ্চিত বড়সাহেবের কাছে তোমাকে নিয়ে গেলে তোমার বাপও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

গত পনের ঘন্টা আমি এই বাড়িতে কাটিয়েছি। সত্যি বলতে কি এতক্ষণ আমি বেশ একটা অস্বস্তিকর ভয়ের মধ্যে ছিলাম।

রেটনিকের কথা শুনে আমি বেশ বড় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

–তাহলে আপনি বলছেন আমি ভাগ্যবান।

–হ্যাঁ। চেয়ারে বেশ হেলিয়ে বসে একটা চুরুটের জন্যে প্যাকেট হাতড়াতে গিয়ে খেয়াল হল তার দাঁতের ফাঁকে একটা নিভে যাওয়া চুরুট আটকানো। সেটা হাতে নিয়ে ছুঁড়ে বাস্কেটে ফেলে দিল। তারপর বলল, দেখ গত চোদ্দ ঘণ্টা আমার টিম এই ঘটনার পেছনে খাটছে। আমরা একজন সাক্ষী পেয়েছি যে তোমাকে ভোর আড়াইটে নাগাদ তোমায় গাড়িতে বুলেভার্ডে দেখেছে। সাক্ষী একজন অ্যান্টনী। বড়সাহেবের সঙ্গে ওর অনেকক্ষণ ধরে খচাখচি চলছে। সুতরাং এই সাক্ষীই বড় ঝাহেবের উল্টোপাল্টা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাদ সাধবে। তাহলে ধরে নিচ্ছি তুমি খুন করনি।

-একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা খুনটা কে করতে পারে এ ব্যাপারে কি আপনার কোন আইডিয়া আছে?

না। এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে সে যেই হোক এখনও পর্যন্ত কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। খুব প্ল্যানমাফিক কাজটা হাসিল করেছে।

চীনা মেয়েটার সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলেন।

–ও, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। মেয়েটার ব্যাগে সাধারণ টুকিটাকি জিনিষ ছিল। এয়ারপোর্ট থেকে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম ও হংকং থেকে এসেছে। নাম জো-অ্যান-জেফারসন। সবচেয়ে অবিশ্বাস্য হচ্ছে মেয়েটা লক্ষপতি তেলের ব্যবসায়ী উইলবার জেফারসনের পুত্রবধূ। স্বামীর নাম হেরম্যান জেফারসন। বছর খানেক আগে ওদের হংকং-এ বিয়ে হয়। তারপর হঠাৎ মোটর দুর্ঘটনায় হেরম্যানের মৃত্যু হয়। তার মৃতদেহ কবর দেওয়ার জন্যে মেয়েটা এখানে নিয়ে আসছিল।

-কেন? আমি রেটনিকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

বৃদ্ধ জেফারসন চেয়েছিলেন ওঁদের পারিবারিক কবরখানাতেই ওদের ছেলেকে সমাহিত করা হোক।

উনি মৃতদেহটা এখানে আনার জন্যে টাকাও পাঠিয়েছিলেন।

–তারপর মৃতদেহটার কি হল?

-সেটা ওঁর আদেশে একজন এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে গেছে। দেখ গিয়ে, এখন ওটা জেফারসনের বারান্দায় রেখে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

–আপনি নিজে গিয়ে দেখে এসেছেন? রেটনিক খুব ক্ষেপে গেল। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, আমার কাজের ব্যাপারে তোমার থেকে জ্ঞান শুনতে চাইনা। আমি নিজে গিয়ে কফিনটা দেখে এসেছি, সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও। সব ঠিক আছে। মেয়েটা হংকং থেকে রাত দেড়টার সময় এয়ারপোর্টে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা তোমার অফিসে যায়। একটা ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না যে, মেয়েটা এখানে এসে সোজা তোমার সঙ্গে দেখা করতে গেল কেন? এবং খুনীই বা জানতে পারল কী করে যে ও তোমার কাছেই যাচ্ছে? তোমার সঙ্গে ওর কি কথাই বা ছিল?

–আমারও তো ঐ একই প্রশ্ন। আর তাছাড়াও যদি হংকং থেকে এসে থাকে আমার কথা জানলই বা কী করে? আমি বললাম।

–তুমি বলেছিলে না তোমার ধারণা মেয়েটা সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ তুমি যখন অফিসে ছিলে না ফোন করেছিল। সেটা খাটছে না। কারণ মেয়েটা সেই সময়ে প্লেনে। আর যদি সে চিঠি লিখে। কোন যোগাযোগ করত, তবে আমরা কিছু জানতে পারতাম।

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম, আচ্ছা রা যাক মেয়েটা এয়ারপোর্টে এসে হার্ডউইকের সাক্ষাৎ পেল। কারণ সে আমাকে ছটায় ফোন করেছিল। আবার এটাও ধারণা করতে পারি যে হার্ডউইক মেয়েটা আসা পর্যন্ত এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করল এবং সে নিজেকে আমি বলে পরিচয় দিল। তারপর মেয়েটার কফিন খালাসের সময়টুকুতে আগে আমার অফিসে গিয়ে পৌঁছল। আর বাইরের দরজার তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে মেয়েটার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

আইডিয়াটা রেটনিকের মনঃপুত হল না। অবশ্য আমার নিজেরও হয়নি।

-কিন্তু তোমার সঙ্গে ওর দেখা করার প্রয়োজনটা কি ছিল? বেশ অসহিষ্ণু হয়ে প্রশ্ন করল।

–এর উত্তর জানা থাকলে আমরা উভয়ে উভয়কে একই প্রশ্ন করে চলতাম। যাকগে মেয়েটার মালপত্রের খোঁজ নিয়েছেন?

–হুঁ। এয়ারপোর্ট ছাড়ার আগে ও নিজের মালপত্র পরীক্ষা করে দেখেছিল। তেমন কিছু না,, একটা সাধারণ সুটকেশে কিছু জামাকাপড়, একটা ছোট বুদ্ধমূর্তি আর কয়েকটা ডার্স স্টিক।

–আপনি মিঃ জেফারসনের সঙ্গে দেখা করেছেন?

মুখটা বিকৃত করে বলল, করেছি। উঁচু মহলের সঙ্গে আমার ওঠাবসা আছে বলে ব্যাটা আমাকে দেখলে জ্বলে যায়। বুঝলে প্রতিপত্তিশালী পরিবারে বিয়ে করার এই জ্বালা। আমার বড় শালার সঙ্গে জেফারসনের সম্পর্ক দা আর কুমড়োর। হতভাগা বলে কি আর যদি আমি তাড়াতাড়ি ওর পুত্রবধূর খুনীকে ধরতে না পারি, তবে ও আমাকে বিপদে ফেলবে। আর ইচ্ছে করলে আমাকে বিপদে ফেলতেও পারে।

এ ব্যাপারে ও আমাদের সাহায্য করবে?

একদম না।

–আচ্ছা সেই এক্সপ্রেস মেসেঞ্জার-এর খোঁজ নিয়েছে? সে হয়ত খুনীকে দেখে থাকতে পারে।

রেটনিক এবার বেশ খচে গিয়ে বলল, দেখ টিকটিকি তুমি নিজেকে যত বড় গোয়েন্দা বলে ভাব, তার অর্ধেকও তুমি নও। আমি সবরকম খোঁজ করেছি ঐ অফিসের বুড়ো কেরানীগুলো খেয়াল করেনি টাকাটা কে দিয়ে গেছে আর একটা ব্যাপার, টাকার খামটা চারটের সময় পাঠানো হয়েছিল এবং নির্দেশ ছিল যে তোমাকে যেন ছটা পনেরর সময় দেওয়া হয়।

হেরন কর্পোরেশনে খোঁজ নিয়েছেন, হার্ডউইক নামের কেউ কাজ করে কিনা।

–ঐ নামের কেউ ওখানে কাজ করে না। অনেক হয়েছে আজ। হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এবার বিছানায় চললাম, কাল কথা হবে।

আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

রেটনিকের চোখ ঢুলুঢুলু। তবুও ওঁকে আর একটা প্রশ্ন করলাম।

-খুনটা কি আমার বন্দুক দিয়েই করা হয়েছে?

–হ্যাঁ, তবে হাতের ছাপ বন্দুকে কিংবা গাড়িতেও পাওয়া যায়নি। ব্যাটা একটা বাস্তু ঘুঘু। তবে একটা ভুল নিশ্চয়ই ও করেছে। সব খুনীরাই করে।

সব খুনীরা নয়, কেউ কেউ। আমি বললাম।

রেটনিক বলল, যাক গে সে সব কথা, আমি তোমাকে অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচিয়েছি, এবার আমার দরকারে আমি তোমার সাহায্য চাই।নতুন কোন আইডিয়া মাথায় এলে বোল। আমার আরো নতুন নতুন আইডিয়া দরকার।

নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ। আমার যথাসাধ্য সাহায্য আমি আপনাকে করব।

নীচে নেমে এসে, গাড়িতে চড়ে, ঘরে এসে ঘুমে ঢলে পড়লাম।

.

১.৪

পরদিন সকাল নটায় অফিস পৌঁছে দেখি ঢোকার মুখে কয়েক জোড়া খবরের কাগজের লোক অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে প্রথমেই প্রশ্ন করল, কাল সারাদিন আমি কোথায় ছিলাম, তারপর খুনের ব্যাপারে নানা প্রশ্ন করতে আমি ওদের নিরাশ করলাম।

আমি সকলকে আমার অফিস ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালাম এবং জানালাম কাল সারাদিন পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ছিলাম। খুনের ব্যাপারে তাদের চেয়ে আমি বেশি কিছু জানিনা। চীনা মেয়ে কি জন্যে এসেছিল, কি করে আমার ঘরে ঢুকল আমার কোন ধারণাই নেই। তারপর আধঘণ্টা ধরে নানা প্রশ্ন করে উত্তর না পেয়ে তারা চলে গেল।

ডাকবাক্সটা খুলে বেশিরভাগ চিঠিই পড়ে আবর্জনা বাস্কেটে ফেলে দিলাম। একটা চিঠি এসেছে পামা মাউন্টেন থেকে এক ভদ্রমহিলা লিখেছেন তার কুকুরকে কে বিষ খাইয়েছে তাকে ধরে দেওয়ার জন্যে।

ঠিক এমনই সময় দরজায় কে টোকা দিল।

আমি তাকে ভিতরে আসতে বললাম। মিঃ ওয়েডে ভেতরে এল।

আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, আপনাকে বিরক্ত করলাম বোধহয়। যদিও এটা আমার কোন ব্যাপার নয় তবুও কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞেস করছি, পুলিশ জানতে পেরেছে খুনী কে?

না। আমি বললাম।

একটা কথা বলার ছিল। একটু ইতস্ততঃ করে বলল, অবশ্য এতে আপনার কোন সাহায্য হবে কিনা জানি না। সেদিন সাতটা নাগাদ, আপনার টেলিফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বেজেছিল।

-আমার ফোন সব সময়ই বাজে। তবে আপনাকে ধন্যবাদ। বলা যায় না এটাও একটা দরকারী খবর হতে পারে। আমি মিঃ রেটনিককে জানাবো।

ওয়েডে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, আমি ভাবলাম এসব খুনের কেসে এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপার অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তবে একটা ব্যাপার সবাই

জানতে চাইছে যে মেয়েটা আপনার ঘরে ঢুকল কি করে। এটা আপনাকে একটু অসুবিধেয় ফেলবে বলে মনে হয়।

না, একটুও না। খুনী আগে থেকেই আমার অফিসে ঢুকেছিল এবং মেয়েটাকে ঢুকিয়েছে।

–তবে তো ভালই। আচ্ছা মেয়েটার সম্বন্ধে কিছু জানা গেল?

–ওর নাম জো-অ্যান-জেফারসন। হংকং থেকে এসেছিল।

-জেফারসন? আমি একজন হেরম্যান জেফারসনকে জানি যে হংকং-এ গিয়েছিল। ও আমার স্কুলের পুরোন বন্ধু।

আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ডেস্কের ওপর পাটা ছড়িয়ে দিয়ে বললাম, তা আপনি এখন বসুন। আর বলুন হেরম্যান সম্বন্ধে কি জানেন। মেয়েটা ওরই স্ত্রী।

ওয়েডে চমকে উঠল। বসে পড়ে বলল, হেরম্যান চীনা মেয়েকে বিয়ে করেছিল?

–তাইতো মনে হচ্ছে।

আমি চুপ করে ওকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, অবশ্য চীনা মেয়ে তো কি? আজকাল তো শুনেছি চীনা মেয়েরা খুবই আকর্ষণীয়া হয়। কিন্তু হেরম্যানের বাবা এটাকে কিভাবে নেবে। আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, এখানে ও কী করতে এসেছিল?

–ও ওর স্বামীর মৃতদেহ এখানে কবর দেওয়ার জন্যে নিয়ে আসছিল।

এবার ও চমকে শক্ত হয়ে গেল।

তার মানে হেরম্যান মারা গেছে?

গত সপ্তাহে...এক মোটর দুর্ঘটনায়।

বোবা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। মনে হল যা শুনল তার কিছুই বুঝতে পারছে না। খালি উচ্চারণ করল, হেরম্যান...মারা গেছে উঃ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। ওর বাবা এ খবর পেলে কি দুঃখ পাবেন। ।

-হ্যাঁ সে তো নিশ্চয়ই। আপনি কি ওদের ভালভাবে জানেন?

–ভালভাবে? না সেভাবে নয়। আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। ও চিরকালই একটু চঞ্চল প্রকৃতির ছিল। একটা না একটা কিছু নিয়ে ঝামেলা পাকাত। মেয়েদের পেছনে গাড়ি ছোটাত। সে সময় ওকে আমার খারাপ লাগত না। এরপর আমি কলেজে ভর্তি হলাম। ওর কোন পরিবর্তন হল না। সেই মদ্যপান, মেয়ে নিয়ে ফুর্তি, অকাজকুকাজ বেড়েই চলতে লাগল। তারপর ওর– সঙ্গে আমি মেলামেশা ছেড়ে দিলাম। পরে ওর বাবা ওকে পূর্ব দিকের কোন দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে বছর পাঁচেক আগের কথা। তারপর পায়ের ওপর পা-টা তুলে বলল, শেষে ও একটা চীনা মেয়েকে বিয়ে করেছিল? এটা কিন্তু ওর পক্ষে খুবই আশ্চর্য ঘটনা।

–কিন্তু এটাই ঘটেছে।

–ও একটা মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে? অবশ্য ও যেভাবে গাড়ি চালাত, তাতে তো যে কোন সময়েই ভেঙে চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারত। এতদিন যে গাড়ি চালাতে পেরেছে, সেটাই মহা আশ্চর্যের। ঘটনাটা শুনে এত খারাপ লাগছে। কিন্তু মেয়েটা খুন হল কেন?

-সেটাই তো পুলিশ খুঁজে বের করতে চাইছে।

–আমি খালি ভাবছি মেয়েটা আপনার কাছে এলে কেন? এটা একটা রহস্য নয় কি?

ভদ্রলোকের এই অযাচিত কৌতূহলে আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, হ্যাঁ।

ও-ঘরে ফোনের আওয়াজ পেলাম। ও উঠে দাঁড়ালো।

-দেখুন তো আমি আপনার কত সময় নষ্ট করলাম। দুঃখিত। যাই হোক হেরম্যান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মনে করতে পারলে আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে এসে জানিয়ে যাবে। এখন চলি।

আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করলাম। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

চেয়ারের গদীতে গা ডুবিয়ে মিঃ ওয়েডে এতক্ষণ যা বলে গেল সেগুলো চিন্তা করছিলাম, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠতে রিসিভারটা তুললাম।

মিঃ জে, উইলবার জেফারসনের সেক্রেটারী বলছি। একটা মেয়েলী, সুন্দর, পরিষ্কার কণ্ঠস্বর, শুনতে বেশ ভাল লাগে। আপনি কি মিঃ রায়ান?

–হ্যাঁ। আমি জবাব দিলাম।

–মিঃ জেফারসন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনি কি আজ বিকেল তিনটে নাগাদ একবার আসতে পারবেন?

আমি উৎসাহিত হয়ে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রেজিস্টার টেনে নিয়ে দেখলাম বেশির ভাগ পাতাই সাদা। তার মানে আজ তিনটের সময় কোন কাজ নেই। এমন কি, এ সপ্তাহটাই আমার কাজহীন কাটবে অর্থাৎ কাজ নেই।

বললাম, ঠিক আছে যাবো।

বীচ ড্রাইভে সমুদ্রের দিকে মুখ করা শেষ বাড়িটা। কোন অসুবিধা হবে না তো? বাড়ির নাম বীচ-ভিউ।

–আচ্ছা। আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবো।

ধন্যবাদ। ওদিকে টেলিফোন রেখে দিল।

মেয়েটার গলার আওয়াজ আমার কানে বাজছে। গলা শুনে মনে হল যুবতী। অবশ্য গলা শুনে চেহারা আন্দাজ করলে অনেক সময় ঠকতে হয়। রিসিভার রেখে দিলাম।

পাশের ঘরে মিঃ ওয়েডে মনে হচ্ছে খুব ব্যস্ত। সারাদিন টেলিফোন বেজেই চলেছে, তার সঙ্গে টাইপ রাইটারের খটখট শব্দ। সন্দেহ নেই, ভদ্রলোক আমার মতো নিষ্কর্মাভাবে কাটাচ্ছে না। পকেটও ভারি হচ্ছে। আমার পকেটে অবশ্য রহস্যময় মিঃ হার্ডউইকের দেওয়া তিনশ ডলার রয়েছে।

বেলা একটার সময় কুইক-ম্যাক্সবার-এ খেতে গেলাম। দেখলাম দোকানে খুব ভিড়। স্প্যানোর মুখ দেখে মনে হল খুনের ঘটনাটা এখনও পর্যন্ত কতখানি এগোল জানার জন্যে খুবই কৌতূহলী। কিন্তু কথা বলার সুযোগ ও পেল না। আমি খেয়ে বেরিয়ে এলাম।

তারপর গাড়ি নিয়ে গেলাম বীচ ড্রাইভ-এ। প্যাসাডেন সিটির মতো বর্ধিষ্ণু এলাকা। ধনী, অবসরপ্রাপ্ত লোকেরা শহরের ভীড় এড়িয়ে একটু নিরিবিলিতে এখানে বাস করে।

-তিনটে বাজার কয়েক মিনিট আগেই আমি বীচ-ভিউ এর ফটকে পৌঁছালাম। প্রায় চল্লিশ গজ ভেতরে গাড়ি চালিয়ে বাড়ির সামনে গাড়ি থামালাম।

বাড়িটা পুরোনো ঢং-এর এবং বড়সড়। সাদা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের সামনে এসে বেল বাজালাম।

বেল টেপার কয়েক মিনিট পর ফ্যাকাসে মুখের এক বাটলার এসে প্রশ্নসূচক ভঙ্গিমায় ভ্র তুলে আমার দিকে তাকাল।

নেলসন রায়ান, আমার এখানে আসার কথা ছিল। আমি বললাম।

বাটলারের ইঙ্গিতে আমি ওর পেছন পেছন চললাম। অন্ধকার হলঘরে কিছু পুরোনো আসবাবপত্র। ওটা পেরিয়ে একটা ছোট ঘর; কয়েকটা চেয়ার আর টেবিল। টেবিলে ম্যাগাজিন। লোকটা আমাকে বসতে বললেও আমি পায়চারী করতে করতে সমুদ্রের শোভা দেখছি। এমন সময়ে একটা মেয়ে ঘরে ঢুকল।

বয়স আটাশ থেকে ত্রিশ-এর মধ্যে। লম্বা, কালো, সুন্দরী। চোখ দুটো কালচে নীল, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। গাঢ় নীল পোষাকে বেশ সুন্দরী দেখাচ্ছিল।

–আপনাকে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত মিঃ রায়ান। ঈষৎ মিষ্টি হেসে বলল, মিঃ জেফারসন এখন আপনার সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত।

–আপনি কি তার সেক্রেটারি?

হ্যাঁ, আমার নাম জেনেৎ ওয়েস্ট। আসুন আমার সঙ্গে।

মেয়েটিকে অনুসরণ করে একটা বড় ঘরে ঢুকলাম। পুরোনো সেকেলে ঘর। সুন্দর বসার ব্যবস্থা। দুটো বড় জানলা খোলা। দূরে গোলাপ বাগান দেখা যাচ্ছে।

মিঃ উইলবার জেফারসন একটা চাকা লাগানো বেড চেয়ারে বসে আছেন। ভদ্রলোক লম্বা, রোগা, খাদা নাক, গায়ের রং হলদে হয়ে যাওয়া পুরোনো হাতির দাঁতের মত, মাথায় সাদা নরম চুল, হাতদুটো নোগা এবং শিরা ওঠা। পরণে সাদা লিনেন সুট, পায়ে হরিণের চামড়ার জুতো। আমি ঘরে ঢুকতে আমার দিকে তাকালেন।

–ইনি মিঃ রায়ান, বলে আমার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে জেনেৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই চেয়ারটায় বসুন, বলে জেফারসন তার খুব কাছে একটা চেয়ার দেখালেন। আবার বললেন, আমার শ্রবণশক্তি ইদানিং একটু কমে গেছে, সুতরাং একটু জোরে কথা বলবেন। আমি বছর ছয়েক হলো ধূমপান ছেড়ে দিয়েছি, আপনি যদি চান তো খেতে পারেন।

–আমি আপনার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়েছি, কিছুক্ষণ নীরবতার পর উনি বললেন। আমি শুনেছি আপনি সৎ, নির্ভরযোগ্য ও বুদ্ধিমান। উনি খুব নিবিষ্ট মনে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন।

আমার সম্বন্ধে এই খোঁজ খবর তাকে কে দিয়েছে জানতে ইচ্ছে হলেও কিনীত মুখে চুপ করে বসে থাকলাম।

–আমি আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি কারণ যে লোকটা আপনাকে ফোন করেছিল এবং আপনার অফিসে চীনা মেয়েটাকে কিভাবে মৃত অবস্থায় দেখলেন, এই পুরো ঘটনাটা মুখ থেকে শুনতে চাই।

লক্ষ্য করলাম উনি আমার পুত্রবধূ বললেন না এবং চীনা মেয়েটা বলার সময় ওঁর মুখের দু-পাশে ঘৃণায় কুঁচকে গেল। অবশ্য অনুমান করা যায় তার মতো প্রাচীনপন্থী ধনী ব্যক্তি তার একমাত্র পুত্র অন্য জাতের বা এশীয় দেশের মেয়েকে বিয়ে করলে তার আপত্তি থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

আমি পুরো ঘটনাটা তাকে বেশ জোর গলায় শোনালাম। আমার কথা শেষ হলে উনি বললেন, ধন্যবাদ মিঃ রায়ান। আপনার সঙ্গে মেয়েটি কেন দেখা করতে এসেছিল, সে ব্যাপারে আপনি কোন আন্দাজ করতে পারেন কী?

-না, আমার কোন ধারণা নেই।

–ওকে কে মেরেছে, সে ব্যাপারে কিছু আন্দাজ করতে পারেন?

না। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললাম, তবে যে লোকটা নিজেকে হার্ডউইক বলেছে, সে হতে পারে কোন ভাবে এই খুনের সঙ্গে জড়িত।

–আমার রেটনিকের ওপর একদম বিশ্বাস নেই। ও একটা গাধা,বুদ্ধ। ঐ পদে চাকরি করার ওর কোন যোগ্যতাই নেই। তবে যে আমার পুত্রবধূকে খুন করেছে আমি তাকে ধরতে চাই। তারপর নিজের হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে বললেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ ছেলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল ছিল না। আজ সে মৃত, এখন বুঝতে পারছিআমি যদি আরও একটু ধৈর্যশীল হতাম, তবে হয়ত ঘটনাটা এরকম হতো না। আমি এটাও জানি যে আমার ধৈর্যের অভাব দুজনের মধ্যে একটা ফাঁক সৃষ্টি করেছিল। ওকে যদি আরও একটু বুঝতে চেষ্টা করতাম তবে ও এতটা অশান্ত হতো না। যাকে । ও বিয়ে করেছিল আমি জানি ও বেঁচে থাকলে খুনীর শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত ও শান্ত হতো না। আমার ছেলে এখন মৃত,সুতরাং ওর স্ত্রীর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা আমার দায়িত্ব। এতে আমি সফল হলে বুঝবো মৃত পুত্রের জন্য এটুকু অন্ততঃ করলাম।

এরপর জেফারসন বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ জানলার দিকে চেয়ে রইলেন। দুঃখী মুখ, কিন্তু বোঝা যায় এই কাজে উনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখুন মিঃ রায়ান, আমি বৃদ্ধ। একটুতেই হাঁপিয়ে যাই। এই দুর্বল শরীরে খুনীকে খুঁজে বের করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। খুনটা যখন আপনার অফিসেই হয়েছে আশা করি এ কেসটা নিতে আপনি আগ্রহীসুতরাং খুনীর অভিসন্ধি আপনাকেও এই কেসেজড়ানো। আপনি কি কাজটা নেবেন? আমি আপনাকে আপনার পরিশ্রমের পুরো মূল্য দেব।

আমি বললাম, এ ব্যাপারে পুরো তদন্ত এখন পুলিসের হাতে। শুধু তারাই খুনীকে খুঁজে বের করতে পারে। তাছাড়া খুনের কেস একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের কাজের আওতার বাইরে। রেটনিক এটা চাইবে না যে বাইরের কেউ এ কেসটায় হাত দিক বা কোন সাক্ষীকে প্রশ্ন করুক। আপনি আমাকে টাকা দিলেও আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না মিঃ জেফারসন।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক আশ্চর্য হলেন বলে মনে হল না, বরং তার চোখেমুখে একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব ফুটে উঠল।

–আমি জানি। তবে রেটনিকের ওপর আমার কোন ভরসা নেই। ওকে বলেছিলাম হংকং-এ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে একটা কেবল করতে যাতে মেয়েটা সম্বন্ধে আরও বিশদ কিছু জানা যায়। আমার ছেলের চিঠি থেকে আমি শুধু এটুকু জানি যে ও একজন রেড চায়নার উদ্বাস্তু। বছর খানেক আগে ও আমাকে চিঠি লিখেছিল যে ও একটা চীনা

উদ্বাস্তুকে বিয়ে করছে। আমি বোকার মত এই বিয়েতে অমত করেছিলাম আর তারপর কোন চিঠিপত্তর পাইনি। একটা গাঢ় নিঃশ্বাস ফেললেন।

–আপনার কি মনে হয় বৃটিশ পুলিশ মেয়েটির সম্বন্ধে আরও বিশদ কিছু জানাতে পারবে? আমি প্রশ্ন করলাম।

উনি মাথা নাড়লেন এবং বললেন, সে সম্ভাবনা আছে, তবে জোর দিয়ে বলতে পারি না। প্রত্যেক বছর কয়েক হাজার রিফিউজি-হংকং-এ আসে। এদের পরিচয়পত্র বা কাগজপত্রও থাকেনা। হংকং-এ অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকায় ওখানকার অবস্থার অনেককিছু জানি আমি। যতদূর জানি রেডচায়না থেকে নৌকোতে এই উদ্বাস্তুদের মাকাউ পর্তুগীজ এলাকায় চালান দেওয়া হয়। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের জন্যে এরা মাকাউতে জায়গার অভাবে হংকং-এ চলে আসে নৌকো করে। সেখানে ব্রিটিশ পুলিশ তাদের নৌকোকে তাড়া করলে ঐ উদ্বাস্তু নৌকোগুলো ওখানকার সাধারণ মাছধরা নৌকো গুলোর সঙ্গে মিশে যায়। দুটো নৌকোই প্রায় একই রকম দেখতে। পুলিশের পক্ষে তাদের খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া ঐ পুলিশরা ওদের ওপর বেশ সহানুভূতিশীল কারণ ওরাও একসময় ঐরকম ভয়ঙ্কর রাত্রি কাটিয়েছে শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে। নৌকোগুলো যখন হংকং এর সমুদ্র সীমানার মধ্যে ঢুকে যায় তখনই রিফিউজি খোঁজা বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ মনে করে এরা সব হারিয়েছে, এদের আবার ফেরৎ পাঠানো অমানুষিক ব্যাপার। তখন বৃটিশ পুলিশ এদের কাগজপত্র দিয়ে নতুন পরিচয় তৈরী করে। কাজেই এদের আসল নামধাম জানার কোন উপায় থাকে না। হংকং-এ ঢোকামাত্র নতুন জীবন শুরু হয় এদের। আমার পুত্রবধূও এদেরই একজন। এখন যতক্ষণ না এর প্রকৃত পরিচয় জানা যাচ্ছে, ততক্ষন খুনী কে, উদ্দেশ্য কি ছিল

কিছুই জানা যাবেনা। তাই আমি বলি তুমি হংকং চলে যাও এবং দেখ এর সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর আনতে পার কিনা। রেটনিক বা বৃটিশ পুলিশ এ ব্যাপারে খুব একটা গা করবে না। খরচপাতি সব আমার। তোমার কি মত?

আইডিয়াটা মন্দ নয়, তবে কতটা সফল হতে পারবে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

–আমি যাবো, তবে মনে হয় খুব একটা সুবিধে করতে পারবো না। যতক্ষণ না ওখানকার হালচাল বুঝছি কিছুই বলা যাচ্ছে না। যাই হোক দেখা যাক।

–তুমি আমার সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বল। সে তোমাকে কতকগুলো চিঠি দেখাবে, আমার ছেলের লেখা। তোমার কাজে লাগতে পারে। যাই হোক যথাসাধ্য চেষ্টা কর। ডানদিকের বারান্দা ধরে চলে যাও, তিন নম্বর ঘরে আমার সেক্রেটারিকে পেয়ে যাবে।

আপাততঃ উনি বিদায় করতে চাইছেন আমাকে, এটা বুঝে উঠে দাঁড়ালাম।

–আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি এক্ষুণি যেতে পারছি না। কেননা রেটনিকের জিজ্ঞাসাবাদ এখনও শেষ হয়নি। কাজেই ওর কাছ থেকে গ্রীন সিগন্যাল না পেলে আমি কোথাও যেতে পারছি না।

উনি মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে। আমি দেখব রেটনিক যাতে তোমাকে কোন বাধা দিতে না পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি চলে যাও।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। ভদ্রলোকের চোখদুটো দেখে মনে হলো বিগত দিনের ঘটনাগুলি স্মরণ করে বেদনায় পাথর হয়ে গেছে।

অফিস ঘরের মত সাজানো একটা বড় ঘরে জেনে ওয়েস্টকে খুঁজে পেলাম। সামনের ডেস্কের ওপর ছড়ানো একগোছ চেকবই, একগোছা বিল। আমি ঢুকতেই মদিরতাময় চোখ দিয়ে ইশারায় আমাকে বসতে বললো।

–আপনি কি হংকং যাচ্ছেন, মিঃ রায়ান, চেক বইটা ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল। বুঝলাম। ও আমাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করছে।

–হ্যাঁ, যাব তো ভাবছি, তবে এক্ষুণি নয়। ভাগ্য ভাল হলে এসপ্তাহের শেষের দিকে যেতে পারব বলে আশা রাখি।

–আপনাকে তাহলে স্মল পক্স টীকা নিতে হবে, কলেরার টীকা নেওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ, তবে ওটা বাধ্যতামূলক নয়।

আমার এসব নেওয়া আছে, এজন্য চিন্তা করবেন না। সিগারেটের বাক্স এগিয়ে দিলাম, ও মাথা নাড়ল, আমি একটা ধরালাম তারপর বাক্সটা পকেটে ভরে রাখলাম। বললাম, মিঃ জেফারসন, ওনার ছেলের লেখা কিছু চিঠিপত্র আপনার কাছে আছে বলছিলেন, ওগুলো আমাকে দিন, এছাড়া সামান্য কোন খবরের সূত্র পেলে আমাকে জানাবেন তাহলে মিছিমিছি সময় নষ্ট হবে না।

–আমি সবকিছু আপনার জন্যে রেডি করে রেখেছি, বলে ড্রয়ার খুলে গোটা ছয়েক চিঠির গোছা আমাকে দিল।

–হেরম্যান বছরে একটার বেশি চিঠি লিখত না। ঠিকানাটা ছাড়া আর কোন খবর চিঠি থেকে পাবেন বলে মনে হয় না।

চিঠিগুলো এক ঝলক দেখে নিলাম, খুব সংক্ষিপ্ত এবং প্রত্যেকটাতেই টাকা পাঠানোর জন্যে জরুরী অনুরোধ। প্রথম চিঠিটার তারিখ পাঁচ বছর আগেকার এবং প্রত্যেকটা চিঠি একবছর অন্তর লেখা হয়েছে। শেষ চিঠিটাই আমাকে আগ্রহী করল।

সেলেশিয়াল এম্পায়ার হোটেল,
ওয়ানচাই।

প্রিয় বাবা,

এখানে আমার সঙ্গে একটা চীনা মেয়ের আলাপ হয়েছে নাম জো-অ্যান। খুব শীঘ্রই একে বিয়ে করছি। মেয়েটা রেড চায়নার উদ্বাস্তু, সংগ্রামী, সুন্দরী, স্মার্ট। আমার মনে হয় খবরটা তোমাকে সুখী করবে না। তুমিই আমাকে শিখিয়েছে নিজের জীবন নিজেরই চালান উচিৎ। সুতরাং আমি ওকে বিয়ে করে সুখী হতে চাই। একটা ঘর খুজছি কিন্তু ভীষণ দামী। তাই ঠিক করেছি বিয়ের পর কিছুকাল হোটেলে থাকব। পরে আমার একটা বাড়ি কেনার ইচ্ছে আছে।

আশা করছি তুমি আমাদের আশীর্বাদ করবে। যদি মনে কর বাড়ি কেনার জন্যে একটা চেক পাঠাবে তাহলে অবশ্যই ভাল হয়।

তোমার
হেরম্যান।

চিঠিটা নামিয়ে রাখলাম।

–এটাই হেরম্যানের লেখা শেষ চিঠি। জেনেৎ কথাগুলো খুব আস্তে আস্তে বলল। মিঃ জেফারসন খুব রেগে গিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারের মাধ্যমে এই বিয়ে করতে নিষেধ করেছিলেন। তারপর আর কোন চিঠি বা কোন খবর পাঠায়নি। এই দিন দশেক আগে এই চিঠিটা এসেছে বলে জেনেৎ একটা চিঠি আমাকে এগিয়ে দিল।হাতের লেখা খুব বাজে।কষ্ট করে পড়তে হল।

সেলেশিয়াল এম্পায়ার হোটেল,
ওয়ানচাই।

মিঃ জেফারসন,

গতকাল এক মোটর দুর্ঘটনায় হেরম্যান মারা গেছে। ও প্রায়ই বলত ওকে যেন আপনাদের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়। আমার কাছে একদম টাকাপয়সা নেই, আপনি যদি কিছু টাকা পাঠান তবে.ওকে আপনার ওখানে নিয়ে গিয়ে

ওর ইচ্ছামতো জায়গায় সমাধি দিতে পারি। এখানে ওকে কবর দেবার মতো পয়সাও আমার কাছে নেই।

—জো-অ্যান-জেফারসন।

চিঠিটা পড়ে সহজেই অনুমান করতে পারলাম কী ভীষণ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছিল।

–তারপর কী হল?

জেনেৎ তার সোনার ফাউন্টেন পেন দিয়ে ডেস্কের ওপর কাল্পনিক আঁকিবুকি কাটতে লাগল।

–মিঃ জেফারসন এই চিঠি পেয়ে ভেবেছিলেন চিঠিতে যা লেখা আছে তা সত্যি নয়। তার। ছেলে মারা যায়নি, মেয়েটা পয়সার জন্যে এই মিথ্যেকথা লিখেছে। আমি হংকং-এ আমেরিকান কনসুলেটে ফোন করে জানতে পারি সত্যিই হেরম্যান মারা গেছে। জেফারসন তখন আমাকে বললেন মেয়েটিকে একটা চিঠি লিখে দিতে যে সে মৃতদেহটা পাঠিয়ে দেয়। মেয়েটির আসার কোন দরকার নেই। ওখানেই সে প্রত্যেক মাসে নিয়মিত ভাবে টাকা পাবে। সে ব্যবস্থা উনি করবেন। কিন্তু জানেন তো ও নিজেও চলে এসেছিল, যদিও এখানে এসে পৌঁছয়নি।

–আর হেরম্যানের ডেডবডি? ওটা কোথায়?

আছে, পরশু সৎকারের সব কাজ করা হবে।

–রুজি রোজগারের জন্য হেরম্যান হংকং-এ কী করত?

-সেটা আমরা ঠিক জানিনা। প্রথম ওখানে যখন যায় তখন ওর বাবা একটা রপ্তানী বাণিজ্য ফার্মে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের চাকরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছ-মাস পরে হেরম্যান সে চাকরী ছেড়ে কি করত তা তার বাবাকে জানায়নি। শুধু প্রত্যেক বছর টাকার জন্য অনুরোধের চিঠি আসত।

–ও যা টাকা চাইত, জেফারসন কি তাই পাঠাত?

–হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও যখনই যা টাকা চেয়েছে, তখনই সেই টাকা পাঠানো হয়েছে।

এই চিঠিগুলো দেখে মনে হচ্ছে হেরম্যান বছরে একবারই টাকা চাইত। এক সঙ্গে কি ও অনেক টাকা চাইত?

না, পাঁচশো ডলারের বেশী কখনও চায়নি।

–পাঁচশো ডলারে তো সারা বছর চলে না। ওর নিশ্চয়ই অন্য কোন রোজগার ছিল।

–হ্যাঁ, তাইতো মনে হয়।

–ঠিক আছে, দেখা যাক।বলে আমি যে প্রশ্নটা করব বলে ভাবছিলাম, সেটা করে ফেললাম।

আপনি কি হেরম্যানকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতেন?

সঙ্গে সঙ্গে জেনেৎ-এর চোখেমুখে চাপা রাগ কয়েক মুহূর্ত ভেসে উঠল আর তারপর স্বাভাবিক হয়ে গেল।

–কেন? হ্যাঁ..হ্যাঁ অবশ্যই। আমি মিঃ জেফারসনের সঙ্গে আট বছর ধরে আছি, হংকং-এ যাবার আগে হেরম্যান এখানেই থাকত। হ্যাঁ, ওকে আমি জানতাম।

–কেমন লোক ছিল? ওর বাবা বলছিলেন ওর স্বভাবটা বন্য ছিল। কিন্তু এখন উনি ভাবছেন যে ওকে একটু বোঝার চেষ্টা করলে হয়তো এতটা বন্যতা ওর মধ্যে আসত না। আপনার কী মনে হয়?

জেনেৎ-এর চোখ-মুখ জ্বলে উঠল। বোঝা গেল ওর ভেতরে কঠোরতাও আছে।

মিঃ জেফারসন ছেলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে খুবই মর্মাহত হয়েছেন। বেশ ধরা গলায় বলল সে। সুতরাং এই মুহূর্তে আরও আবেগপ্রবণ। হেরম্যান লম্পট ছিল। ও ওর বাবার এমনকি আমার টাকাও চুরি করেছিল। মিঃ জেফারসন খুবই সুন্দর মানুষ, কোন নীচ কাজ করেননি। ওর ছেলে এমন কী করে হয়, আমি ভেবে পাইনা।

-ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

–আমি মিঃ জেফারসনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তবে অনেকটা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে।

জেনেৎ সই করা চেকগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে একটা টেনে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিল। বলল, মিঃ জেফারসন আপনাকে আগাম কিছু টাকা দিতে বলেছেন। আপনি যাবার দিন জানালেই আমি প্লেনের টিকিট কেটে রাখব। আপনার যদি আরও টাকার দরকার লাগে আমাকে জানাবেন।

আমি চেকটার দিকে তাকালাম। এক হাজার ডলারের চেক।

আমার রেট অত বেশী নয়। তিনশ ডলারই যথেষ্ট। আমি বললাম।

মিঃ জেফারসন আপনাকে এই টাকাই দিতে বলেছেন। জেনেৎ বলল।

–ভাল কথা। টাকা কেউ দিতে চাইলে আমি অবশ্য অস্বীকার করিনা। দিন। চেকটা নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করলাম–আপনি কি মিঃ জেফারসনের সবকিছু দেখাশোনা করেন?

–আমি ওর সেক্রেটারি। ধারালো সংক্ষিপ্ত জবাব।

–হুঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি কবে যেতে পারব জানতে পারলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছি, এমন সময় জেনে জিজ্ঞাসা করল, ওকে কি দেখতে খুব সুন্দর ছিল?

প্রথমটায় আমি ধরতে পারিনি, কি বলতে চাইল। শান্তভাবে চেয়ারে বসে থাকলেও ওর সারা মুখে কৌতূহলের অভিব্যক্তি।

কাকে? হেরম্যানের স্ত্রীকে? হুঁ, সুন্দরীই তো মনে হল। অনেক চীনা মেয়ের মতো এও সুন্দরী ছিল এমনকি মারা যাবার পরও।

–হুঁ। চোখটা নামিয়ে উত্তর দিল।

কলম টেনে নিয়ে সে আবার. চেক সই করতে লাগল।

যাই হোক আমি এগোলাম।

হলের কাছে এসে দেখি বাটলারটা অপেক্ষা করছে। আমাকে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালো এবং চুপচাপ পথ দেখিয়ে আমাকে বাইরে নিয়ে গেল।

আস্তে আস্তে গাড়ির দিকে এগোলাম। জেনেৎ-এর শেষ প্রশ্নটায় এটা মোটামুটি নিশ্চিত হলাম। যে জেনেৎ এবং হেরম্যান উভয়ে প্রণয়াসক্ত ছিল। হেরম্যানের বিয়ে এবং মৃত্যু দুটোতেই জেনে সমান আঘাত পেয়েছে।

গাড়ি চালিয়ে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে চলে এলাম। আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর রেটনিকের ঘরে ঢুকে দেখি চেয়ারে বসে অভ্যেসমত পোড়া চুরুট চিবোচ্ছে।

–তোমার সঙ্গে বকবক করে নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে আছে? দরজাটা বন্ধ করে ওর ডেস্কের সামনে যেতে বল, কি দরকার?

আমি বললাম, মিঃ জেফারসন আমাকে ঐ ব্যাপারে বলতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু ভাবলাম এটা আপনাকে জানানো উচিত।

ওর মুখ শক্ত হয়ে গেল।

–তুমি যদি তদন্তের কাজে কোনরকম ঝামেলা কর তো আমি তোমার লাইসেন্স বাতিল করাব। এই সাবধান করে দিচ্ছি। খানিক থেমে আবার বলল, কত টাকা দিচ্ছে তোমাকে?

যথেষ্ট টাকা দিচ্ছে। আর আপনার কাজে ঝামেলা করার মত সুযোগ পাওয়ার আগেই আমি হংকং চলে যাচ্ছি।

-কোথায়? হংকং? এঃ, দরকার হলে তো আমিই যেতে পারতাম। সেখানে গিয়ে কি পাবে, বল তো?

মিঃ জেফারসন চাইছেন যে মেয়েটার আসল পরিচয় বা তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ভালভাবে জেনে এগোলে কেসটার সুরাহা করা যাবে। ওঁর ধারণা ঠিকও হতে পারে।

অস্থিরভাবে বলপেনটা নাড়াচাড়া করে রেটনিক বলল, ওখানে গিয়ে লাভ কিছু হবে না। শুধু টাকা আর সময়ের অপব্যবহার। অবশ্য টাকা পেলে তোমার কিছু যায় আসে না।

আমি একটু ফিচেল হাসি হেসে বললাম, ঠিকই, ওঁর বাজে খেয়াল মেটাবার জন্য যথেষ্ট টাকা আছে। আর আমারও নষ্ট করার মত অফুরন্ত সময় আছে। বলা যায় না, হয়তো এর থেকেই আমার ভাগ্য খুলে যেতে পারে।

–আমাকে মেয়েটার সম্বন্ধে জানতে হংকং-এ যেতে হয়নি। আর আমি যতটা জানি তুমি হংকং গিয়েও জানতে পারবেনা। আমি শুধু একটা কেবল করে সব খবর পেয়ে গেছি।

–কি কি খবর পেলেন?

–মেয়েটার নাম জো-অ্যান-চিয়াং।বছর তিনের আগে ও ম্যাকাউ থেকে এসে হংকং-এনামার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ছ-সপ্তাহ জেলে থাকার পর ওকে কাগজপত্র দেওয়া হয়। তারপর থেকে ও প্যারোডা ক্লাবে রাত্রে নাচত। সুতরাং মনে হয় ও ছিল একটা বেশ্যা।

জানলার দিকে তাকিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে আবার শুরু করল, গত একুশে সেপ্টেম্বর ও হেরম্যানকে বিয়ে করে আমেরিকাননসুল থেকে। তারপর ওরাসেলেশিয়াল হোটেলনামে একটা চীনা হোটেলে থাকত। জেফারসন কোন রোজগার করত না। মেয়েটা যা আনত আর বুড়োর কাছ থেকে ছোকরা যা হাতাতে পারত তাতেই চলতো ওদের। এবছর ছই সেপ্টেম্বর ছেলেটার মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। মেয়েটা তখন ওর ডেডবডি এখানে আনার জন্য আমেরিকান। কনস্যুলেটে আবেদন জানায়। এই তো ঘটনা। এর জন্য হংকং যাওয়ার কি দরকার?

-আমাকে ওখানে যাওয়ার জন্যে টাকা দেওয়া হয়েছে আর এখানে থেকে আপনার কাজের কোন ঝামেলা করতে চাইনা।

শয়তানের মতো হেসে বলল, আমার কাজে ঝামেলা...? তোমার ঝামেলা করার মত ক্ষমতা কতটুকু? কি হে টিকটিকি? জানো আমি ইচ্ছে করলেই তোমাকে আমার পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারি।

আমি চুপ করে ওর কথাগুলো শুনে গেলাম আর ভাবলাম এ ধরণের লোকগুলো নিজেদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। ব্যাটা সেরকমই ভাবুক।

কিছুক্ষণ পর বললাম, যাক, কেস কতদুর এগোলো? আরও নতুন কিছু জানতে পারলেন?

নাঃ। একটা জিনিষ আমার মাথায় ঢুকছে না, ও ভোর তিনটের সময় তোমার অফিসে এসেছিল কেন?

–ঠিক। হয়তো হংকং গেলে এর উত্তর পাবো। একটু থেমে সিগারেট ধরিয়ে আবার বললাম, বৃদ্ধ জেফারসনের প্রচুর সম্পত্তি। এর উত্তরাধিকারী ছিল হেরম্যান। এখন হেরম্যানের মৃত্যুতে ওর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী জো-অ্যানই। এখন আমাকে দেখতে হবে যে, এমন কেউ কি আছে যে, অ্যানকে সরিয়ে দিতে পারলে সেই হবে ঐ সম্পত্তির মালিক। কে-সে? এটা জো-খুন এর একটা মোটিভ হতে পারে।

রেটনিক মাথা নাড়ল। হু, তোমার এই আইডিয়াটা চিন্তা করার মত।

–আপনি কি বুড়োর সেক্রেটারি জেনেৎ-এর সঙ্গে কথা বলেছেন? যদি জেফারসনের মৃত্যুর পর ও কিছু টাকা-পয়সা পায়, আমি তাতে আশ্চর্য হবনা। আমার মনে হয় একসময় হেরম্যানের সঙ্গে ওর প্রেম ছিল। নিটের সময় মেয়েটা যখন খুন হয় জেনেৎ সেই সময় কোথায় ছিল, সেটা একবার খোঁজ করতে পারেন।

–সেটা কিভাবে করব? বুড়োর তো সব ব্যাপারেই জেনেৎ। এখন আমি যদি ওর ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি মারি তবে ও আমাকে বিপদে ফেলতে পারে। আমি সেটা করবনা। তারপর আশাভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, তুমি কি করে জানতে পারলে জেনে বুড়োর ছেলের সঙ্গে প্রেম করত?

কথা বলে। একসময় ওর মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমার মনেহয় ও খুনের ব্যাপারে আরও বেশী কিছু জানে, এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন কিছুই জানো। খোঁজ নেবেন আরও ওর কোন বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা।

–ওসব খবরে আমার দরকার নেই। আমার খালি একটা খবর দরকার মেয়েটা তোমার অফিসে কেন এসেছিল। ব্যাস! এটা জানতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান করে ফেলব।

–আমি উঠে দাঁড়ালাম।

আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন। আমার সম্বন্ধে অনুসন্ধান কখন করছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে ছেড়ে দিলে ভাল হয়।

আগামীকাল দশটায়। কাল অবশ্যই তুমি এখানে আসবে। বলপেন, দিয়ে ব্লটিং পেপার ফুটো করতে করতে বলল, তবে খেয়াল থাকে যেন কিছু জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।

মনে মনে ওকে মুখ ভেংচে বেরিয়ে এলাম।

অফিসে ফিরে এলাম। ঘরের দরজা খুলতে যাব এমন সময় হঠাৎ একটা আইডিয়া মাথায় আসতে হেঁটে মিঃ জে. ওয়েডের ঘরে টোকা মেরে ঢুকে গেলাম।

বেশ বড় অফিস। সুন্দর আসবাবপত্র। টেবিলে রয়েছে একটা টেপরেকর্ডার, একটা টেলিফোন আর একটা পোর্টেবল টাইপ রাইটার।

ডেস্কের সামনে ওয়েডে বসে পাইপ টানছে। হাতে কলম, সামনে কাগজ।

ওয়েডের ডানদিকের দরজা দিয়ে টাইপরাইটারের টক টক্ শব্দ আসছে।

ঘরটা আলো বাতাস যুক্ত। দেখলেই বোঝা যায় ভাল পার করেছে। আমার মত একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের চেয়ে ওর পয়সা খরচ করার ক্ষমতা অনেক বেশী।

-আরে, আসুন আসুন। আমাকে দেখে বেজায় খুশী। গদিমোড়া একটা চেয়ারে বসতে বলল।

আমি এগিয়ে এসে চেয়ারে বসলাম।

–আপনি আসবেন ভাবতেই পারিনি। ও ওর সোনার ওমেগা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, কি খাবেন বলুন? ছটা বাজে, একটু স্ক হয়ে যা।

আমাকে আপ্যায়নের জন্য ভদ্রলোক বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি সম্মতি জানালাম। খুব তাড়াতাড়ি ড্রয়ার থেকে একটা বোতল আর দুটো গ্লাস বের করে গ্লাসে ঢালল। বরফ নেই বলে দুঃখ প্রকাশ করল। বললাম আমি এই জিনিস নীট খাই এবং এখনও বেঁচে আছি, বলে দুজনে হেসে পানীয়টা খেলাম। ভাল স্কচ।

–সেদিন আপনি হেরম্যানের সম্বন্ধে বলেছিলেন। আপনার যদি তার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা থাকে তাহলে বলতে পারেন। আমি সেই খোঁজেই এসেছি। যে কোন বিষয় জানালে আমার কাজে আসবে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়ই বলে আগ্রহী দৃষ্টি হেনে বলল, কোন্ ব্যাপারে জানতে চান বলুন!

আমি মুখে একটা হাসি ফোঁটালাম যার মানে আমি কোন্ ব্যাপারে জানতে চাইছি আপনি বেশ ভাল করেই জানেন। এই ধরণের লোকদের এই ভাবেই কাৎ করতে হয়।

মুখে বললাম, সেটা আমি কি করে বলি? যেকোন খবরই সমান প্রয়োজনীয়। যেমন ধরুন ওর চরিত্র। মেয়েদের ব্যাপারে ও কেমন ছিল?

–মেয়েছেলে নিয়ে তো একেবারে নোংরা ছিল।

ওয়েডের চোখে একটা ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ দেখলাম।

-যৌবনে মেয়েছেলে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি সবাই করে। কিন্তু ও ছিল একেবারে নোংরার হদ্দ। ওর বাবার যদি এশহরে প্রতিপত্তি না থাকত, তবে তো এতদিনে ওরনামে অনেক স্ক্যান্ডাল ছড়িয়ে যেত।

–বিশেষ কোন মেয়ের সঙ্গে ওর কিছু? আমি প্রশ্ন করলাম।

একটু ইতস্ততঃ করে, আমি কারোর নাম ঠিক বলতে চাইনা, তবে ওর বাবার সেক্রেটারি জেনেৎ ওয়েস্ট-এর সঙ্গে ছিল। মেয়েটা..আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে বলল, মাপ করবেন ভাই, আমার বলা উচিৎ হবেনা। এসব ঘটেছিল বছর নয়েক আগে। হেরম্যান আমাকে বলেছিল।

দুঃখিত মুখে বললাম, আপনার দেওয়া সামান্য সংবাদ থেকে খুনের কিনারা করতে পারি। দেখুন বলবেন কি বলবেন না সেটা আপনার বিবেচনা।

কাজ হল আমার কথায়। ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বলল, ঠিক আছে, নিশ্চয়ই এটা আমার বলা উচিত। মাথায় হাত বুলিয়ে এমন একটা ভাব দেখাল, যেন কোন সত্যবাদী এবং নির্মল চরিত্রের এক ভদ্রলোক কিছু বলছেন।

-নবছর আগে জেনেৎ আর হেরম্যানের মাখামাখি সম্পর্ক ছিল। একটা বাচ্চাও হয়। হেরম্যান জেনেৎকে কাটানোর চেষ্টা করলে জেনেৎ ওর বাবাকে সব কথা বলে দেয়। বাবা রেগে যান এবং জেনেৎ-কে বিয়ে করতে বলেন। এই প্রস্তাব হেরম্যান সরাসরি উড়িয়ে দেয়। বাচ্চাটা অবশ্য পরে মারা যায়। মনে হয় মেয়েটার ওপর ভদ্রলোকের খুব

মায়া হয় এবং ওকে প্রাইভেট সেক্রেটারি করে নেন। ভদ্রলোক হয়তো ভেবেছিলেন বাড়িতে জায়গা দিলে ছেলের মনের পরিবর্তন হবে। কিন্তু যখন বুঝলেন সে সম্ভাবনা নেই তখন তিনি ছেলেকে পূর্বদেশে পাঠিয়ে দিলেন। তখন থেকে জেনেৎ ঐ বুড়োর কাছেই আছে।

মেয়েটা বেশ আকর্ষণীয়া না? আশ্চর্য লাগছে মৌয়টা এখনও বিয়ে করেনি কেন?

এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বৃদ্ধ ভদ্রলোক হয়তো তা চাননি। কারণ তিনি মেয়েটার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাছাড়া ওঁর মৃত্যুর পর বিপুল সম্পত্তির ভার মেয়েটার ওপরই মনে হয় বর্তাবে।

তাই নাকি! অনেক কষ্টে আগ্রহ দমন করলাম এবং বললাম–নিশ্চয়ই ওঁর আরো কোন নিকট আত্মীয় আছে।

না, আমি ওদের পরিবারকে অনেকদিন ধরে জানি। হেরম্যান একসময় আমাকে বলেছিল, ওদের পরিবারে আর কোন দাবীদার না থাকায় ওর বাবার সম্পত্তির অধিকারী ও একাই। আমি বাজী রেখে বলতে পারি, বুড়োর মৃত্যুর পর জেনেৎ ওর সম্পত্তির কোন ভারী একটা অংশ বাগাবে।

–হু, মেয়েটার ভাগ্য ভাল। কারণ হেরম্যানের স্ত্রী বেঁচে নেই ভাগ বসাবার জন্যে।

–না, ও বেঁচে থাকলেও চীনা বলে ভদ্রলোক ওকে কিছু দিয়ে যেতেন না।

তা না দিলেও তোও হেরম্যানের স্ত্রী হিসেবে দাবী করতে পারত, জজসাহেব একটু দয়ালু হলে কিছু অংশ ও অবশ্যই পেত।

ওয়েডের ডানদিকের দরজা খুলে একটা মেয়ে ঢুকল। এক গোছ চিঠি রেখে চলে গেল। আমি বললাম, যা অনেক ধন্যবাদ। এবার আমি চলি। আবার দেখা করব।

নতুন কিছু জানা গেল? পুলিশ কি নতুন কিছু সূত্র পেয়েছে?

না আগামীকাল জুরীদের সামনে অনুসন্ধানের কাগজপত্র দেওয়া হবে। মনে হয় জুরীরা রায় দেবেন যে, কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি মেয়েটাকে খুন করেছে। খুব প্ল্যানমাফিক খুনটা করা হয়েছে।

–যদি কিছু করতে পারি...আমাকে জানাবেন।

–হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনাকে সব জানাবো।

আমার অফিসে এসে রেটনিককে ফোন করলাম। জেনেৎ সম্বন্ধে আমার জ্ঞাত খবর সব জানালাম।

ব্যাপারটা পুরোপুরি আপনি দেখছেন। আমি বললাম–আপনার জায়গায় আমি থাকলে কিন্তু জো-অ্যানের খুনের সময়ে জেনে কোথায় ছিল খোঁজ নিতাম।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে ভারী নিঃশ্বাস ফেলে রেটনিক বলল, আমি আমার জায়গায় আছি।

ও আবার বলল, কাল অনুসন্ধান ঘরে ঠিক সময়মত এসো দয়া করে, পরিষ্কার জামা কাপড় পরে আসতে ভুলো না কিন্তু।

রেটনিক বলে চলল,করোনার জজ খুব সামান্য ব্যাপার নিয়ে ভীষণ হৈ-চৈ করে। শালা একটা কুকুরীর বাচ্চা।

টেলিফোন রেখে দিল।

আমিও রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

.

১.৫

যেমন ভেবেছিলাম, করোনার কোর্টে বিচারের মাধ্যমে অনুসন্ধান কোনোরকম হট্টগোল ছাড়াই শেষ হল। মোটা কুতকুতে একটা লোক নিজেকে জেফারসনের অ্যান্টনী বলে রেটনিককে পরিচয় দিল। জেনেৎকে গাঢ় রং-এর পোলাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমাকে ও যা যা বলেছিল, মোটামুটি সেগুলোই করোনার জজকে ও বলল। রেটনিক ওর কথা বলল। আমি আমারটা বললাম। জজ পুলিশকে আরও অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে বলল। আমার মনে হয় একটা চীনা উদ্বাস্তু মারা গেছে বলে কেউ তেমন গা করছেনা। জজ কোর্ট থেকে চলে গেলে আমি রেটনিকের কাছে গেলাম।

তাহলে এখন তো আর আমার শহর ছেড়ে যেতে কোন বাধা নেই?

না, না, তোমাকে এখন আটকে রাখার দরকার নেই।

ঘরের এক কোণে জেনেৎ জেফারসনের অ্যাটর্নীর সঙ্গে কথা বলছিল। সেদিকে ধূর্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, খবর নিয়েছিলে সেদিন রাত্রে ঐ মেয়েছেলেটা বিছানায় বা অন্য কোথায় ছিল?

–সেটাতো আপনার এক্তিয়ার। আমি বললাম–যান না, ওকে জিজ্ঞেস করুন। সঙ্গে ওর অ্যান্টনী আছে। এটাই তো ভাল সময়।

রেটনিক মুচকি হাসল।

আমার অত গরজ নেই। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে, যাও বুড়োর পয়সায় কদিন ফুর্তি করে এসো। ওখানে ওরকম বাজারের অনেক মেয়েছেলে পাওয়া যায়, তারা বেশ আনন্দও দিতে পারে।

রেটনিক চলে যাবার পর আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। জেনেৎ যখন দরজার দিকে এগোচ্ছে ওকে পাকড়াও করলাম।

–আগামীকাল যেতে পারি। কোন প্লেনে রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে?

চোখের দৃষ্টি সহজ হল। হ্যাঁ মি রায়ান আমি আজ সন্ধ্যায় আপনার টিকিটের ব্যবস্থা করে রাখব। আপনার আর কিছু দরকার হবে?

–হ্যাঁ, মানে হেরম্যানের ফটোগ্রাফ দরকার। দিতে পারবেন?

ফটোগ্রাফ? ও অবাক হলো।

–ওটার প্রয়োজন হতে পারে। আমি মর্গ থেকে ওর স্ত্রীর একটা ফটো নিয়ে নেব।

–আচ্ছা। দেব আপনাকে একটা।

–আজ সন্ধেবেলা আমরা যদি রাত আটটা নাগাদ এ্যাক্টর বার-এ দেখা করি কেমন হয়?

–ঠিক আছে আটটার সময়।

ধন্যবাদ। এতে আমার অনেক উপকার হবে।

মিষ্টি হেসে চলে গেল জেনেৎ।

দেখলাম দু-সীটের জাগুয়ারটা নিজেই ড্রাইভ করে চালিয়ে চলে গেল।

ওর দিকে অত নজর দিও না, আমি নিজেকে নিজে বললাম।

অফিসে ফিরে এলাম।

আপাততঃ আমার হাতে এমন কিছু কাজ নেই যে কয়েক সপ্তাহ বাইরে কাটালে এমন কিছু অসুবিধা হবে।

ভাবছিলাম বাইরে গিয়ে স্যান্ডউইচ খেয়ে আসি। এমন সময় টোকা মেরে ওয়েডে এসে ঢুকল।

–আমি আপনাকে আটকাবো না। আমি শুধু জানতে এলাম হেরম্যানের সৎকারের কাজ কখন হবে, আমার সে সময়ে থাকা উচিত।

আগামীকাল। কিন্তু সময়টা তো জানিনা।

–ও। ঠিক আছে, আমি মিস ওয়েস্টকে ফোন করে জেনে নেব। না গেলে ওরা হয়তো কিছু মনে করবে।

আমি আজ সন্ধ্যেতে মিসওয়েস্টের সঙ্গে দেখা করছি, আপনি বললে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি।

–তাহলে তো ভালই হয়। ওর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার পক্ষে জিজ্ঞেস করাটা কেমন অস্বস্তিকর।

–ঠিকই তো। আমি বললাম।

করোনার কোর্টে বিচারের কি হল?

মুলতুবি করে রেখেছে। একটু থেমে সিগারেট ধরিয়ে বললাম, আমি কাল হংকং যাচ্ছি।

আপনি? তাই নাকি? যান ভালই লাগবে। এই খুনের কেসের ব্যাপারে যাচ্ছেন?

নিশ্চয়ই। আপনার বন্ধুর বাবা আমাকে পয়সা কড়ি দিয়ে নিয়োগ করেছেন। কাজেই আমি যাচ্ছি।

বাঃ। ওখানে আমারও অনেকদিনের যাবার ইচ্ছে। আপনার ভাগ্য দেখে আমার হিংসে হচ্ছে।

–আমার নিজের ওপরই হিংসে হচ্ছে।

–যান আপনার মুখে সব কিছু শুনব। গেলে ও ব্যাপারে কিছু জানতে পারবেন বলে মনে হয়?

–জানি না। দেখি চেষ্টা করে।

–হু, তাহলে আপনি মিঃ জেফারসনের সঙ্গে দেখা করেছেন? কেমন লাগলো ভদ্রলোককে?

–মন্দ নয়? খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক। অবশ্য উনি বেশীদিন বাঁচবেন বলেও মনে হয়না।

হু। সত্যিই, বয়স তো অনেক হল। ছেলের মৃত্যুর শকও তো পেয়েছেন। এগোতে এগোতে বললেন, ঠিক আছে, চলি। আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার জন্যে কিছু করতে হলে বলবেন।

-না, ধন্যবাদ। আমি অফিস বন্ধ করে যাব।

–ঠিক আছে। ফিরে এলে একদিন সময় দেবেন। ড্রিংকস নিয়ে বসে আপনার গল্প শুনব। আপনি সকারের কথাটা জানতে ভুলবেন না।

না, না। আমি কাল আপনাকে জানিয়ে দেব।

বিকেলে গাড়ি চালিয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে চলে এলাম। রেটনিককে বলা ছিল ও মর্গ থেকে জো-অ্যান-এর একটা ফটো তুলিয়ে রেখেছিল। ফটোটায় অ্যানকে জীবন্ত মনে হচ্ছে। গাড়িতে বসে ফটোটা খুঁটিয়ে দেখছিলাম।মর্গের পরিচারকের কাছেঅ্যান-এর সৎকারের ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিলাম। বলেছিল, আগামী পরশু জেফারসনের খরচে উডসাইড় সিমেট্রি-তে কবর দেওয়া হবে। তার মানে ওদের পারিবারিক কবর এলাকায় ওকে কবর দেওয়া হচ্ছে না।

ছটার সময় অফিসে তালা দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। একটা ব্যাগে কয়েক সপ্তাহের দরকারী জিনিষ গুছিয়ে সোজা এ্যাক্টর বার-এ গিয়ে হাজির হলাম। ঘড়িতে তখন ঠিক আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী।

আমার ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাটায় আটটা তখন জেনেৎ এল। খুব সুন্দর সেজেছে।

আমি কোণের দিকে একটা টেবিলের সামনে বসেছিলাম। ও আমার দিকে এগিয়ে আসার সময় দেখলাম বারের সমস্ত পুরুষ অকিয়ে দেখছে। প্রথমে দু চারটে কথা বলার পর আমি ওর জন্যে ভোদা-মাচিনী আর আমার জন্যে স্কচ অর্ডার দিলাম।

ও আমাকে প্লেনের টিকিট আর একটা চামড়ার সুন্দর মানিব্যাগ দিল।

–কিছু হংকং ডলার এর মধ্যে আছে। উপকারে আসবে ওখানে গেলে। ওখানে আপনার থাকার জন্যে একটা টেলিফোন করে দেব।

দি পেনি সুলার আর মিরমো হচ্ছে ওখানকার সবচেয়ে ভাল হোটেল, জেনেৎ বলল।

ধন্যবাদ। কিন্তু আমি চেষ্টা করব হোটেল সেলেশিয়াল এম্পায়ার-এ থাকতে।

খানিক সচকিত হয়ে বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

ফটোর কথা আপনাকে বলেছিলাম, মনে আছে?

ওয়েটার এসে পানীয় দিয়ে গেল। জেনেৎ ওর হাতব্যাগ থেকে আমাকে একটা খাম দিল। হাফ পোস্টকার্ড সাইজের ফটো। মুখে অল্প হাসি, চোখে অসীম ধূর্ততা। দেখতে মোটেও সুন্দর নয়, মোটা ভুরু, চোয়াড়ে চেহারা, ছোট মুখ, ভাঙা চোয়াল।

আমি বেশ অবাক হলাম। কারণ হেরম্যানকে এরকম দেখতে হবে ভাবতে পারিনি। এরকম চেহারার লোকেরা ভীষণ জ্বর হয় এবং নোংরা কাজকর্ম করতে পারে। জেনেৎ-এর ওর সম্বন্ধে বলা কথাগুলো মনে পড়ল।

আমি চোখ তুলে দেখলাম ও আমাকে লক্ষ্য করছে।

হু, আপনার কথাগুলো আমার মনে পড়ছে। একে জেফারসনের ছেলে বলে মনে হয়না।

জেনেৎ চুপ করে রইল। আমি হেরম্যানের ফটো ব্যাগে ঢুকিয়ে জো-অ্যান-এর মর্গ থেকে তোলা ফটোটা বের করলাম।

জেনেৎকে ফটো দেখিয়ে বললাম, আপনি জানতে চেয়েছিলেন মেয়েটাকে দেখতে কেমন, এই দেখুন ওর ফটো এনেছি।

অনেকক্ষণ ধরে ও ফটোটা নেবার জন্যে হাত বাড়াল না। আলোতে ওর মুখটা দেখলাম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, তারপর ফটোটা নিয়ে দেখতে লাগল, দেখলাম ওর চোখ-মুখ অভিব্যক্তিহীন। তারপর ফটোটা আমাকে ফেরৎ দিল।

হু, ওর গলার স্বর ভারী হয়ে গেছে। দুজনে দুটো গ্লাস নিয়ে পান করলাম।

আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, আপনি বলেছিলেন না আগামীকাল হেরম্যানের সত্ত্বার?

-হ্যাঁ।

-হেরম্যানের এক বন্ধুর নাম জে. ওয়েডে, আমার অফিসের পাশেই ওর অফিস। হেরম্যানের সঙ্গে একই স্কুলে পড়াশুনা করেছে। ও সৎকারের সময়টা জানতে চেয়েছে।

দেখলাম জেনেৎ বেশ শক্ত হয়ে গেল।

–মিঃ জেফারসন এবং আমি ছাড়া, হেরম্যানের কোন বন্ধুকে ওখানে আমার চাইছি না।

–ঠিক আছে, আমি বলে দেব। ও কিছু ফুল পাঠাতে চাইছিল।

–ওখানে ফুল পাঠানোর কোন প্রয়োজন নেই। এবার আমি চলি। মিঃ জেফারসন আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। আমি আপনার জন্যে আর কিছু করতে পারি?

ওর এই কথা শুনে আমি বেশ একটু হতাশ হলাম। মনে এই আশা নিয়ে এসেছিলাম যে, ওর সঙ্গে আলাপ করে ওকে একটু ভালভাবে জানব। কিন্তু সে সুযোগ আর কোথায় দিল। এই তো হাল।

না ধন্যবাদ। প্লেন কখন ছাড়বে?

এগারোটায়, আপনি সাড়ে দশটার মধ্যে এয়ারপোর্ট পৌঁছে যাবেন।

ধন্যবাদ।

জেনেৎ এগিয়ে যেতে আমি ওয়েটারের হাতে দু-ডলার গুঁজে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

বার-এর ঠিক উল্টোদিকে জাওয়ারটা দাঁড় করানো। আমিতো অন্ততঃ একশ গজ দূরে গাড়ী পার্ক করতে বাধ্য হয়েছি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, জেফারসনের এই শহরে বেশ প্রতিপত্তি আছে।

গাড়ীর সামনে এসে ও একটু হাসল। তারপর বলল, আশা করি আপনি আপনার কাজে সফল হবেন। যাবার আগে যুদি কিছু প্রয়োজন হয় তো একটা টেলিফোন করবেন।

–আচ্ছা, আপনি কাজে বাইরে কি আর কিছু জানেন না। একটু হেসে বললাম, প্রাইভেট সেক্রেটারিও তো কাজের সময়ের বাইরে একটু সহজ হতে পারেন।

–ওকে ক্ষণিকের জন্যে অবাক হয়ে যেতে দেখলাম। আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

কোন কথা না বলে পরিচ্ছন্নভাবে গাড়ীতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল।

-গুডনাইট, মিঃ রায়ান। গাড়ী স্টার্ট করে সেকেন্ডের মধ্যে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম আটটা বেজে পঁয়ত্রিশ, ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে ডিনার খাব। কিন্তু কিছু করার নেই।

ধূস শালা! মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। আমার যে পাঁচ-ছটা মেয়ের সংগে আলাপ আছে, তাদের কাউকে ডেকে ডিনার খেয়ে নেব। নাঃ ওয়েস্টের জায়গায় কাউকে মনে ধরল না। ঠিক করলাম, স্যান্ডউইচ খেয়ে, টেলিভিশন দেখে সময় কাটাবো।

একটু হেঁটে মাল বারে ঢুকলাম বাজনা বাজছে। ঢোকার মুখে দুটো মেয়ে আমার দিকে ঢলঢলে চোখে ফিরে তাকালো। জিন্স প্যান্ট, সোয়েটার পরে বসে আছে। আমি ওদের পাশ কাটিয়ে ঢুকে একটা টেবিলে গিয়ে বসলাম।

বীফ আর হ্যাম-স্যান্ডউইচ খেয়ে ভাল লাগলো না। হেরম্যান আর অ্যানের ফটো দুটো বের করে দেখতে লাগলাম। মনে হল দুজনের মধ্যে সবদিক থেকে অমিল। আমি ভাবলাম, জেনে এরকম একটা লোককে কি করে ভালবাসল?

আকাশ-পাতাল চিন্তা করে ফটো নিয়ে উঠে পড়লাম। স্যান্ডউইচের দাম মিটিয়ে রাস্তায় নামতে কানে এলো মেয়েদুটো আমাকে দেখে হাসছে আর ক্যাবলা বলে আওয়াজ দিল। দিক!

গাড়ী চালিয়ে আমার ডেরায় ফিরে এলাম। একটা অ্যাপার্টমেন্টের ওপরের তলায় একটা বড়সড় লিভিংরুম, একটা ছোট বেডরুম আর কিচেন নিয়ে আমার ডেরা। প্যাসাডেনা সিটিতে আসার পর থেকে এখানেই আছি। এখানে ভাড়া সস্তা এবং সবদিক থেকে সুবিধাজনক। বাড়ীতে কোন লিফটু নেই। তাতে আমার ক্ষতি কিছু নেই। পাঁচতলায় উঠতে নামতে আমাকে যে সিঁড়ি ভাঙতে হয়, তাতে আমার শরীরটা বেশ ফিট থাকে।

তালা খুলে লিভিং রুমে ঢুকলাম। দরজা বন্ধ করার আগে লোকটাকে আমি দেখতে পাইনি ঘরটা অন্ধকার বলে। লোকটার গায়ে কালো পোষাক।

আমার ঘরের উল্টোদিকে নিওন আলোয় গুড়ো সাবানের বিজ্ঞাপনের প্রতিফলনে ওকে দেখতে পেলাম।

জানলার ধারে আমার প্রিয় হাতলওলা চেয়ারে ও বসেছিল। একটা পায়ের ওপর আর একটা পা ভোলা। কোলের ওপর খবরের কাগজ। যেন আরাম করে কোলের ওপর হাতদুটো রেখে বসে আছে।

আমি হঠাৎ ওকে দেখে চমকে গেছি। হাতের কাছের সুইচটা তাড়াতাড়ি জ্বেলে দিলাম। আঠারো-উনিশ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে। চেহারা, কাঁধদুটো বেশ শক্তসমর্থ। কালো চামড়ার জ্যাকেট পরা, মাথায় কালো উলের টুপী। গলায় রুমাল বাঁধা।

ঠিক এই ধরণের ছেলেগুলোকে রাত্রে বার-এর সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। বাস্তবিকই রাস্তার জঘন্য প্রকৃতির ছেলে।

ছেলেটার চোখ দুটো ভাবলেশহীন। দেখলেই বোঝা যায় মদ্যপ, ধূমপায়ী, খুন করতে কোন দ্বিধা করেনা। ডানদিকের কানটা নেই। কানের ডগা থেকে থুতনী পর্যন্ত কাটা দাগ। এরকম ভয়ঙ্কর কুৎসিত দর্শন লোক আমি আগে কখনও দেখিনি।

চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমার গা ঘিনঘিন্ করে উঠল।

-এই শালা, বেশ্যার বাচ্চা। আমি তো ভেবেছিলাম তুই ফিরবি না, মোটা ঘড়ঘড়ে গলায় ও বলল। আমার পিস্তলটা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে কোথাও পড়ে আছে। এখন বুঝতে পারছি ওটা থাকলে উপকারে আসত।

–এখানে তুমি কি করছ?

আরাম করছিরে কুত্তার বাচ্চা। বোস্, তোর সঙ্গে কথা আছে। একটা চেয়ার দেখাল আমাকে।

লক্ষ্য করলাম ওর হাতে কালো সুতীর দস্তানা। আমার শরীরে ভয়ের শিহরণ বয়ে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম এ বোধহয় ভাড়াটে খুনী। আমাকে খুন করতে এসেছে। কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে ওর নিজের ওপর খুব আস্থা আছে।

গলায় যথাসম্ভব জোর এনে ভারী গলায় বললাম, আমি তোমাকে বেরিয়ে যাবার জন্যে দু সেকেন্ড সময় দিলাম। না গেলে এ ঘর থেকে তোমায় ছুঁড়ে ফেলে দেব।

ও নাকটা দস্তানা দিয়ে ঘষতে ঘষতে ফিকে হাসি হাসতে লাগল। হাত থেকে ওর কাগজটা পড়ে গেল মেঝেতে আর দেখলাম ওর কোলের ওপর পয়েন্ট ফোর-ফাইভ পিস্তল। একটা বারো ইঞ্চি মত লম্বা ধাতুর নল-এর ব্যারেলের সঙ্গে আটকালো।

চুপ শুয়োরের বাচ্চা। খ্যাক করে উঠল। আমি জানি তোর একটা রডও নেই। পিস্তলটা হাতে নাচাতে নাচাতে নলটা চেপে দিল, ব্যস্। এখন গুলি চালালেও কোন শব্দ হবেনা। এতে তিনটে গুলি আছে। অবশ্য তোর জন্যে একটাই যথেষ্ট।

আমি ওর দিকে তাকালাম। বদমাশটা আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে সামনে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম। দুজনের মধ্যে দূরত্ব ফুটের।ওখানে বসেই। ওর ঘামের আর তামাকের নোংরা গন্ধ আমার নাকে ভেসে এল।

কী চাই তোমার? আমি বললাম।

এখনও তোর বেঁচে থাকার ইচ্ছে আছে? কীরে কুত্তার বাচ্চা? কিন্তু আমি তোকে বাঁচতে দেবনা। মরতে তোকে হবেই।

সাপের মত ঠাণ্ডা চাউনী, ফোলা ফ্যাকাসে চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল।

কেন আমি মরবো? একটা কিছু বলার জন্যে বললাম, কেন আমি তো বেশ ভালই আছি।

না, ভাল থাকতে পারবিনা। পিস্তলটা আস্তে আস্তে আমার দিকে ঘুরিয়ে বলল, কটা মেয়ের সঙ্গে তোর ভাব আছে বল?

–বেশ কয়েকজন–কেন?

–এমনি, ধর তোকে যদি এখন এই পিস্তলটা দিয়ে ঝেড়ে দিই, কটা মেয়ে কষ্ট পাবে?

দু-একজন পেতে পারে। দেখ এসব উল্টোপাল্টা কথার অর্থ কি? তোমার সঙ্গে আমার কি কোন ঝগড়া আছে? তাহলে তুমি আমার পেছনে কেন লেগেছ?

সে সব কিছু নয় রে হারামী। ওর রক্তহীন কোঁচকানো ঠোঁট কামড়ে শয়তানী হাসি হেসে। বলল, তোকে দেখতে তো বেশ ভাল, আস্তানাটাও ভাল, যখন আসি তখন তোকে লক্ষ্য করছিলাম–গাড়িখানাও তত বেশ জব্বর।

আমি গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

–তোমার পিস্তল বরং সরিয়ে রাখো। এ কথায় কোন কাজ হবে না জেনেও বললাম, এসো আমরা স্কচ পান করি।

আমি মদ খাই না।

–ভাল। মাঝে মাঝে আমারও মনে হয় যে বলি মদ খাই না। তা আজ তোমার সম্মানে একটু হয়ে যাক।

মাথা নাড়ল ছোকরা। শালা এটা কি ড্রিঙ্কিং পার্টি?

এই সমস্ত আজেবাজে কথাবার্তা চালিয়ে আমি ঠিক করে নিয়েছি কি করব। ছোকরা আমার সমান লম্বা। প্রথমেই যদি লাফ মেরে ওকে একটা আঘাত করি, তাহলে মনে হয় ওর সঙ্গে যুঝতে পারব। কিন্তু ওর কাছে পিস্তল আছে।

–তাহলে এটা কিসের পাটি? প্রশ্ন করে আমি আমার ডান পা-টা একটু এগিয়ে দিলাম। এমন পোজিশন নিলাম যাতে সুযোগ পেলেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

–গুলি ছোঁড়ার পার্টি রে হারামীর বাচ্চা। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল।

কাকে গুলি মারা হবে?

–তোকে রে বুদ্ধ।

আমি ঘামতে লাগলাম। জীবনে অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি কিন্তু জীবন মৃত্যুর মাঝখানে এমনটি আগে কখনও হয়নি।ঠিক করলাম, ভীরুতাকে প্রশ্রয় দিলেভীরুতা আরো চেপে বসবে। বললাম, কিন্তু কেন গুলি করবে বলবে তো!

জানি না। আর আমার জানার দরকারও নেই। আমার কিছু পয়সা পাওয়া নিয়ে কথা।

আমার সারা শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। জিভ শুকিয়ে কাঠ।

–আমাকে মারার জন্যে তোমাকে টাকা দেওয়া হয়েছে? তাই না?

–হ্যাঁ, তাই। টাকা ছাড়া তোকে আমি মারতে যাবো কেন?

কম্পিত গলায় আমি বললাম, ঘটনাটা আমাকে সব খুলে বল। আমাদের হাতে অনেক সময় আছে। কে তোমাকে পাঠিয়েছে। আমাকে খুন করে তোমার কি হবে?

–আমি জানি না, যাঃ। কোন কাজকর্ম ছিল না, ধান্দায় ঘুরছিলাম। একটা কুত্তা শালা এসে বলল, তোর এখানে আসতে হবে, তোকে হাপিস করতে পারলেই পাঁচশ ডলার দেবে। একশ ডলার দিয়েছে আর চারশো কাজ হাসিলের পর। তাই তোর এখানে এসেছি।

-লোকটা কে?

বলব না রে শালা। সে নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। ও শালা রাস্তার কোন পাবলিক। মাথায় একটা গুলি ঝাড়ব, চিন্তা মাথা থেকে বেরিয়ে যাবে।

–লোকটাকে দেখতে কেমন? মরীয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

হঠাৎ ও হিংস্রভাবে আমার দিকে তাকাল। পিতলটা আমার কপালে টিপ করে হিংস্র স্বরে বলল, সেটা জেনে তোর কাজ কি? তোর সময় শেষ, সেটাই চিন্তা কর। আমি বুকে বল এনে, মন শক্ত করে বললাম, পাঁচশো ডলার কি যথেষ্ট? আমি তোমাকে হাজার ডলার দোব। বন্দুকটা নামিয়ে নাও।

চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কাউকে কথা দিলে কথার খেলাপ করিনা।

ঠিক সেই সময়ে টেলিফোনটা বেজে উঠল। এদিকে আমিও গত কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে আমার কর্মপন্থা ঠিক করে নিয়েছি। টেলিফোনের আওয়াজে খানিকটা চমক ভেঙে ও চোখ কুঁচকে ফোনের দিকে তাকাল।

আমি আমার মাথা ওর মুখের দিকে আর হাতটা ওর পিস্তলের দিকে লক্ষ্য করে শক্ত হয়ে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ ঠিক রকেটের মত ছিটকে ওকে আঘাত করলাম। আমার শক্ত মাথা ওর নাকে আর মুখে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল। একই সঙ্গে বিশাল ওজনের একটা ঘুষি চালালাম ওর পিস্তল ধরা হাতে। ও সশব্দে চেয়ার নিয়ে পড়ে গেল। আমি একটু সরে গেলাম।

ঐ আচমকা আঘাতে ও রীতিমত ঘাবড়ে গেছে, না হলে ও আমাকে ওর মজবুত দু-হাত দিয়ে গুড়ো করে দিতে পারতো। ঐ ঘুষিতেও ওর হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ল না।ও ওঠার আগেই আমি খাড়া বসাবার কায়দায় ওর দুটো কাঁধে পরপর দুটো ঘুষি চালালাম। ওর হাতদুটো আলগা হয়ে পিস্তলটা মেঝেতে পড়ে গেল। আমিনীচু হয়ে তুলতে যেতেই

ও বিদ্যুৎবেগে আমার চোখের ওপর ঘুষি চালাল। ঠিক যেন হাতুড়ির বাড়ি খেয়ে আমি ছিটকে পড়লাম।

আমি সম্বিৎ হারিয়ে ফেললাম। কয়েক সেকেন্ড বাদে স্বাভাবিক হতে দেশি ও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, ওর নাক মুখ দিয়ে প্রচুর রক্ত ঝরছে। ও আমার মাথা লক্ষ্য করে লাথি চালাল।

আমি দুহাত দিয়ে লাথি আটকাবার চেষ্টা করলাম এবং একটু গড়িয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। দুজনে দুজনের মুখোমুখি, মাঝখানে মেঝের ওপর পড়ে আছে পিস্তল।

ও ক্রুদ্ধ কুকুরের মত চীৎকার করে উঠল। কিন্তুনীচু হয়ে ভুল করেও পিস্তলটা তোলার চেষ্টা করলনা। ও জানত তাহলে আমি ওকে লাথি মেরে গুঁড়ো করে দেব। কাজেই ও ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত তেড়ে আসতেই আমি ওর মুখে সজোরে একটা ঘুষি চালালাম। ও ছিটকে আমার একটা ঝোলানো ছবির ওপর গিয়ে পড়ল।

আমি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফিয়ে মাথা দিয়ে ওর মুখে, নাকে আঘাত করলাম এবং পর পর ছ খানা খুঁখি ওর পেটে মারলাম। ও ঘূষিগুলো খেয়ে একটু নরম হয়ে গেল আর ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকাল। তারপর আবার কতকগুলো ঘুষি চালাতেই দেখিওর হাতে চচ্চকে একখানা ছুরি। চোখে খুনীর দৃষ্টি।

কী বীভৎস দেখতে হয়েছে লোকটাকে। নাক, মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে জমে আছে। আমি কয়েক পা পিছিয়ে এলাম, ওর খ্যাপা কুকুরের মত তাড়া খেয়ে।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকতেই এক ঝটকায় গায়ের কোট খুলে বাঁ হাতটা পুরো জড়িয়ে নিয়ে, ছুরি তোলার সঙ্গে সঙ্গে সেটা এগিয়ে দিলাম। ছুরিটা আমার কোটে জড়িয়ে গেল। আমি ঠিক সেই মুহূর্তে একটা নিখুঁত, সময়মত ও কার্যকরী একখানা ঘুষি মারলাম ওর চোয়ালে। ওর মুখে একটা কঁক করে আওয়াজ বেরোল। একটু ঝুঁকে পড়তেই ঘাড়ে একটা। ছুরিটা খসে পড়ল। আমি বিদ্যুৎবেগে লাথি মেরে ছুরিটা মেঝের অন্যপ্রান্তে সরিয়ে দিলাম। ও মেঝেতে পড়ার সময়ে ওর চোয়ালে আর একখানা বিশাল ঘুষি মারতেই একটা বিশাল শব্দ করে কার্পেটের ওপর থুতনী রেখে ও আছড়ে পড়ল।

দেওয়াল ধরে ঝুঁকে কুকুরের মত হাপাচ্ছিলাম। শরীরে কোন জোর নেই। এরকম ঘুষি কাউকে কোনদিন মারিনি বা খাইনি। হঠাৎ দড়াম করে একটা আওয়াজ হল। দেখি দরজা খুলে দুটো পুলিশ ঢুকলো হাতে বন্দুক।

কী ব্যাপার! সমস্ত রকটাকে কাঁপিয়ে কী ধরণের মারপিট হচ্ছে আঁ? একটা পুলিস ঝাঁঝিয়ে উঠল।

পুলিস দুটো ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানটা মেঝের ওপর গড়িয়ে গিয়ে ওর পিস্তলটা তুলে নিল। তখনও ওর চারশো ডলার আয় করার ইচ্ছে ছিল। আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল কিন্তু গালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দেওয়ালের প্লাস্টারের চাপড়া ভেঙ্গে পড়ল।

একটা পুলিশ ওকে গুলি করল। আমি চীৎকার করে বাধা দিতে গেলাম কিন্তু ততক্ষণে ছোকরা শেষ। হাতটা তুলেছে আমাকে দ্বিতীয় গুলি মারবে বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২.১

সামনের বোর্ডে নো-স্মোকিং লেখা জ্বলে উঠতেই আমার পাশের সহযাত্রী একটু ঝুঁকে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোকের মাথায় চঞ্চকে টাক, বেশ মোটা চেহারা। বাঃ! এই তো আমরা হংকং পৌঁছে গেলাম। ভদ্রলোক ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, কিন্তু তার বিরাট মাথা ডিঙিয়ে আমার পক্ষে বাইরেটা দেখা সম্ভব ছিলনা, তাই বেল্ট বাঁধতে ব্যস্ত হলাম। ভদ্রলোক আবার বললেন, ওরা বলেছিল যে এটা নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। জানিনা ওদের কথা কতটা সত্যি।

আমাকে দেখে ভদ্রলোক বেল্ট বাঁধতে ঝুঁকে পড়তে আমি ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে জানলার দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখলাম সবুজ পাহাড়, নীল সমুদ্রের জলে সূর্যের আলো পড়ে চিকচি করছে সমুদ্রে বেশ নৌকো ভাসছে। মোটা ভদ্রলোক যিনি হনলুলু থেকে আমার সহযাত্রী ছিলেন, প্লেন রানওয়েতে নামতে ও তার ক্যামেরা, ব্যাগ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আপনি কি পেনিনসুলা হোটেলে থাকছেন? ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

না, আমি ওখানে থাকছিনা।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কউলুন তো বেশ ভাল জায়গা। ভাল হোটেল, দোকানপাট সবই এখানে আছে। আপনি কি ব্যবসা সংক্রান্ত কোন কাজে এসেছে?

–আজ্ঞে হ্যাঁ।

–আচ্ছা সেজন্যই এখানে থাকছে না? আমি মৃদু হাসলাম। ভ্রমণটা বেশ ভালই লাগল, একটু লম্বা বটে কিন্তু বেশ উপভোগ্য।

কাস্টমস-এর ঝামেলা পেরিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে কোলাহলমুখর এয়ারপোর্টের ব্যস্ত এলাকায় এসে দেখি সেই মোটা ভদ্রলোক হোটেলবাস এ উঠছেন। উনি আমাকে হাত নাড়লেন, আমিও হেসে হাত নাড়লাম।

প্রায় আধডজন বয়স্ক, শুকনো চামড়ার, হলদেটে রং-এর রিক্সাওয়ালা একসঙ্গে চীৎকার আমাকে ডাকতে লাগল। কী করবো ভাবছি। এমন সময় বেঁটে একটা মোটাসোটা চীনা এসে বুকে অভিবাদন জানাল। মাফ করবেন, আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? আপনার কি ট্যাক্সি লাগবে?

-আমি ওয়াঞ্চাতে যাব, সেলেশিয়াল এম্পায়ার হোটেলে।

–আচ্ছা ওটা তো দ্বীপের ওপর। আপনি তাহলে ট্যাক্সি নিয়ে ফেরিঘাটে গিয়ে ওখান থেকে নৌকো করে ওয়াঞ্চাই চলে যান। ফেরিঘাটের উল্টোদিকেই আপনার হোটেল।

অশেষ ধন্যবাদ। আমি বললাম, ড্রাইভারেরা কি ইংরাজী বুঝতে পারে?

-হ্যাঁ, অল্পসল্প ইংরেজী সবাই বুঝতে পারে, বলে ইশারা করে একটা ট্যাক্সি ডাকল। লোকটার পিছু পিছু আমি ট্যাক্সিতে গিয়ে বসলাম। ড্রাইভার একজন রোগা চীনা, জামাকাপড় নোংরা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নামাল।

এ আপনাকে ফেরিঘাটে নিয়ে যাবে স্যার! ভাড়া হংকং ডলারে ছয় ডলার। আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমেরিকান এক ডলার হংকং-এর ছয় ডলারের সমান। লোকটা সামান্য হেসে বলল, আপনার হোটেল খুজতে কোন অসুবিধা হবে না।

বললাম, ফেরিঘাটের ঠিক উল্টোদিকে?

একটু ইতস্ততঃ করে সোনা বাধান দাঁত বের করে হেসে লোকটা বলল, কিছু মনে করবেন না স্যার। আপনি যে হোটেলে যাচ্ছেন সেখানে আমেরিকানরা সাধারণতঃ থাকেনা, বেশীর ভাগ আমেরিকানরা গুসেস্টার নয় পেনিনসুলায় থাকে।

-ঠিকই বলেছেন। আমি একটু হেসে বললাম, তবে আমিওখানেই উঠবো। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

–আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। বলে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে আমাকে দিল। এখানে আপনার একজন গাইডের প্রয়োজন হতে পারে। আপনি শুধু একটা ফোন করলেই...।

–অনেক ধন্যবাদ। আমার মনে থাকবে। কার্ডটা ওর হাত থেকে নিয়ে ঘড়ির চেনের তলায় রাখলাম। লোকটা অভিবাদন করে চলে গেল। আমি ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলাম।

প্লেনে আসতে আসতে আমি হংকং-এর ভৌগলিক বিবরণ দেখে নিয়েছিলাম। কাই-তাক এয়ারপোর্ট কউলুন উপদ্বীপে অবস্থিত। প্রণালী পার হলে হংকং দ্বীপ। ফেরিতে মিনিট পাঁচেক পার হতে লাগে। ওয়াঞ্চাই যেখানে হেরম্যান থাকত, সেটা হংকং-এর সমুদ্র এলাকার একটা শহর।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফেরিঘাটে পৌঁছে, কউলুন-এর এই সমুদ্র এলাকায় এসে দেখি গাদা গাদাকুলি বিশাল বিশাল মোট বয়ে নিয়ে চলেছে। কেউ ট্রাফিক মানছেনা। চেঁচামেচি হৈ-হট্টগোল। বড় বড় আমেরিকান গাড়ি চলছে, মালিক চীনা ব্যবসায়ীরা। কিছুকুলি দু-চাকার ঠেলায়, কিছু কুলি বাঁশের টুকরোতে মোট ঝুলিয়ে দুজনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক দোকানের সামনে ভীষণ ভীড়, চীনা পুরুষ-মহিলা দাঁড়িয়ে কাঠি দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি কিছু খাচ্ছে। কিছু নোংরা জামাকাপড় পরা, রোগা বেঁটে চীনা ছেলেমেয়ে পিঠেবাচ্চা বাঁধা,রাস্তার একধারে খেলা করছে। একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম, এখানে একশজন চীনা পিছু একজন ইউরোপীয়ান। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে একটা বোটে গিয়ে বসলাম। বোটে চীনা ব্যবসায়ী, আমেরিকান ট্যুরিস্ট আর কিছু চীনা মেয়ে বসেছিল।

আমি বোটের একধারে একটা সীটে বসে হংকং-এর দিকে রওনা হলাম। আমি আরাম করে বসে আগের ঘটনাগুলো স্মরণ করতে লাগলাম। মনে হল, অনেকক্ষণ হল আমি প্যাসাডোনা সিটি ছেড়ে এসেছি। অবশ্য আমার এখানে আসা বেশ কয়েকদিন পিছিয়ে গেছিল কারণ আমার ঘরের সেই ভয়ঙ্কর অতিথি। রেটনিককে শুধু বলেছি, আমি ঘরে ঢুকেই লোকটাকে দেখতে পাই এবং ও আমাকে মারতে আসে তখন আমিও ওকে মারি।

হাতে সাইলের পিস্তল ছিল। সম্ভবতঃ ছিঁচকে চোর হবে হয়তো। রেটনিক আমার কথা বিশ্বাস করেনি। বলেছিল, গাধা ছিঁচকে চোর সাইলের পিস্তল নিয়ে কারোর ঘরে ঢোকে না।আমি মনে মনে হেসে আমার কথাতেই অটল ছিলাম। যথেষ্ট সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও অবশেষে হংকং-এ এসে পৌঁছেছি।

আমি স্থির নিশ্চিত ঐ খুনেটাকে যে পাঠিয়েছিল সে সেই রহস্যময় হার্ডউইক। আমি আর একটা পয়েন্ট থ্রি এইট পুলিশ স্পেশাল কিনেছি সেটা ভবিষ্যতে কখনও কাছ ছাড়া করবনা।

বোটটা ফেরিঘাটে নামার জায়গায় গিয়ে পৌঁছাল। সব যাত্রীই নামার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ওয়াঞ্চাই শতকরা একশ ভাগ চীনা শহর। দুজন আমেরিকান খালাসী ছাড়া সবাই চীনা। প্রচুর সুন্দর দেখতে চীনা মেয়ে, তাদের কালো চোখের তারায় আমাকে আমন্ত্রণ জানাল।

একপাশে ছড়ির দোকান আর একপাশে বাচ্চাদের খেলনার দোকান, দুটো দোকানের মাঝখান দিয়ে সেলেশিয়াল এম্পায়ার হোটেলে ঢোকার রাস্তা।

হোটেলে ঢুকলাম। রিসেপশনে একজন বৃদ্ধ চীনা বসে আছে মাথায় টুপি, গায়ে কালো কোট, থুনীতে সাদা দাড়ি। বাদামের মত দুটো চোখ, তাতে নির্জীব দৃষ্টি।

আমার একটা ঘর চাই। ব্যাগটা রেখে বললাম। আমার জামাকাপড় খুব একটা ভাল ছিল না। প্লেনের ধকলে নষ্ট হয়ে যাওয়া জামাকাপড় দেখে আমাকে খুব পয়সাওয়ালা মনে হচ্ছিলনা।

অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে খুব নিরাসক্তভাবে আমার সামনে একটা বাঁধানো খাতা আর পেন রাখল। আমি যথাযথ জায়গায় আমার নাম, ঠিকানা লিখে ফেরৎ দিলাম, লোকটা একটা চাবি বোর্ড থেকে নিয়ে কাউন্টারের ওপর রাখল।

দশ ডলার। একটু থেমে বলল, সাতাশ নম্বর ঘর।

চাবিটা আমি তুলে নিলাম। লোকটা ডানদিকের পথ দেখিয়ে দিতে আমি সরু পথটা ধরে এগিয়ে গেলাম। পাশের একটা ঘর থেকে এক আমেরিকান খালাসী বেরিয়ে এল। রাস্তাটা খুব সরু। ওর পেছনে মোটাসোটা ছোট স্কার্ট পরা চীনা মে। সারা মুখে বিরক্তির ছাপ। আমি সব কিছু পেরিয়ে অবশেষে সাতাশ নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। তালা খুলে ঘরে ঢুকলাম।

একটা দশফুট বাই দশফুট ঘর। একটা চেয়ার, দুটো বিছানা, দেওয়ালে একটা কাপবোর্ড, মেঝেতে এক চিলতে কাপেট, ঘরে একটা জানলা।

ব্যাগ রেখে বিছানায় বসলাম, বিছানাটা শক্ত। খুব ক্লান্ত লাগছিল। এখন মনে হচ্ছে গ্লসেস্টার বা পেনিনসুলা হোটলে থাকলেই হত। ওখানে ডি-লুক্স শাওয়ারে চান করে, বরফ দিয়ে বীয়ার খেয়ে আরাম করা যেত। কিন্তু আমি তো আরাম করতে আসিনি। এসেছি কাজে। কিছুক্ষণ জিরিয়ে, হাত-মুখ ধুয়ে খানিকটা ভাল লাগল। হোটেলটা বেশ

ঠাণ্ডা। ট্রাফিকের মৃদু আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। হাতের ঘড়িতে দেখলাম ছটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। ঘড়ির স্ট্র্যাপের নীচে রাখা গাইডকার্ডটা বের করলাম। ওয়ন-হপ-হো। ইংরেজী বলিয়ে গাইড। নীচে টেলিফোন নম্বর দেওয়া। মানিব্যাগে রাখলাম।

তারপর দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি আমার উল্টোদিকের ঘরে একটা চীনামেয়ে দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। শরীরের গঠন ভারী সুন্দর, চক্চকে কালো চুলে একটা বিনুনী। সাদা টাইট ব্লাউজ পরনে, নীচে নীল রঙের চাপার্ট। সারা দেহে যৌবনের প্রাচুর্য। যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

–হেই মিস্টার। বেশ বড় করে একমুখ হেসে বলল, আমি লেইলা, তোমার নাম কি?

নেলসন রায়ান। দরজায় চাবি দিতে দিতে বললাম, শুধু নেলসন বললেই হবে। তুমি কি এখানেই থাক?

-হ্যাঁ। নরম দৃষ্টিতে আমার সারা শরীরটা তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলল, এখানে খুব কম আমেরিকানরা থাকে, তুমি কি থাকবে নাকি?

–সেই রকমই ইচ্ছে আছে। তুমি এখানে কতদিন আছ?

আঠারো মাস। মেয়েটার অদ্ভুত উচ্চারণে ওর কথা বোঝার জন্যে আমাকে খুব মন দিয়ে শব্দ কটা শুনতে হচ্ছে। ও হেসে কি বলতে চাইল আমি বুঝলাম, যখন আরাম করার ইচ্ছে হবে, তখনই আমার ঘরে চলে এসো। কেমন?

হকচকিয়ে উত্তর দিলাম, ঠিক আছে মনে থাকবে।

একটু দুরে ভেতর দিকে একটা দরজা খুলে বেঁটেমত একজন লোক মনে হল ফরাসী নয় ইতালীয় আমাকে অতিক্রম করে চলে গেল। পিছনে অল্পবয়সী একটা চীনা মেয়ে। মেয়েটার বয়স বড় জোর ষোল। এটা যে কী ধরনের হোটেল বুঝতে আর বাকী রইল না আমার। লেইলা খুব শান্ত স্বরে বলল, তুমি আমার ঘরে কি এখুনি আসবে? একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। বললাম, না ঠিক এখন নয়। এখন একটু ব্যস্ত আছি।

–আমেরিকান ভদ্রলোকেরা সবসময়ই ব্যস্ত থাকে। ও বলল, তাহলে আজ রাত্রে আসবে তো?

–আমি তোমাকে জানাব।

মেয়েটা ক্ষেপে গেল।

-এটা কোন কাজের কথা নয়। হয় বল আসবে, না এলে বল আসবে না।

–সে তো ঠিক কথাই। এখন আমার জরুরী কাজ আছে। বলেই আমি প্যাসেজ দিয়ে তাড়াতাড়ি লবিতে চলে এলাম। দেখি সেই ক্লার্ক ধ্যানে রয়েছে।

রাস্তায় এলাম। রিক্সাচালক ছেলে আমাকে দেখে ছুটে এল।

–পুলিশ হেডকোয়ার্টারে চলল। সঙ্গে সঙ্গে রিক্সা ছুটল। প্রতি মুহূর্তে আমার ভয় করছিল এই বুঝি বিশাল ট্রাক আমাকে চাপা দিয়ে দেবে। গাড়িগুলো কোন গ্রাহ্য না করে যেন গায়ের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

অবশেষে হংকং সেন্ট্রাল পুলিশ স্টেশনে সশরীরে এসে নামলাম। দেখি অক্ষত অবস্থাতেই আছি।

গেট দিয়ে ঢুকে এক সার্জেন্টকে মোটামুটি কাজের কথাটা বোঝাতে সে একটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অফিস দেখিয়ে দিল। ঘরে চীফ ইন্সপেক্টর বসে আছেন। বয়স্ক, সাদা চুল, বড়সড় মিলিটারী গোঁফ। আমি ওকে আমার পরিচয় দিতে উনি নিজের পরিচয় দিলেন। ভদ্রলোকের নাম ম্যাকার্থী। উচ্চারণ স্কটিশ।

-জেফারসন? শরীরটা হেলিয়ে পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো? কয়েকদিন আগে প্যাসাডোনা সিটি থেকে এই ব্যাপারে একটা খোঁজ চেয়ে পাঠিয়েছিল। আমি নিজে সেটার উত্তর পাঠিয়েছি। লোকটা আপনার কে হয়?

আমি জানালাম আমি ওর বাবা মিঃ জে. উইলবার জেফারসনের হয়ে কাজ করতে এসেছি। আপনি এ ব্যাপারে যা কিছু জানাতে পারবেন তাতেই আমার কাজ হবে। হেরম্যান ও তার স্ত্রী মিস অ্যানের সম্বন্ধে সামান্যতম কোন খবরও আমার কাজে আসতে পারে।

–আপনি বরং আমেরিকান কনস্যুল অফিসে যান। ওরা আপনাকে সাহায্য করতে পারে। পাইপে আগুন দিয়ে সুগন্ধী ধোঁয়া ছেড়ে বলল,আমি ওর ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানিনা।

শুধু এটুকুই জানি একটা মোটর দুর্ঘটনায় ও মারা গিয়েছিল। সেটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন?

–দুর্ঘটনা কিভাবে ঘটেছিল?

–ভিজে রাস্তায় খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। গাড়ির মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। গাড়িতে আগুনও ধরে গিয়েছিল। আমরা যখন দেখতে পাই তখন আর কিছু করার ছিল না।

-ওর সঙ্গে কেউ ছিল কি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

না।

–ও কোথায় যাচ্ছিল?

ম্যাকার্থী চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকাল।

-তা জানি না। দুর্ঘটনা ঘটেছিল কউলুন থেকে মাইল পাঁচেক দূরে, নিউটেরিটোরীতে। কাজেই ও যেখানে খুশী যেতে পারত।

–ওকে কে সনাক্ত করেছিল?

একটু নড়ে বসল। মনে হল কষ্ট করে ধৈর্য রাখার চেষ্টা করছে।

-ওর স্ত্রী।

–লোকটার এখানে কিভাবে চলত? মানে ও কী করত বলতে পারেন?

–সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভবনয়। এখানে কেউ নিজে থেকে গণ্ডগোল না পাকালে আমরা তার পেছনে লাগিনা। জেফারসন সেরকম কোন গণ্ডগোল করত না। আর যতটুকু জানি তাতে তাকে সুনাগরিক বলা যায় না। ওর খ্রীঅনৈতিক উপায়ে...মানে বুঝতেই পারছেন, যা রোজগার করত তাতেই ওদের চলত। আর পুলিশ এতে হস্তক্ষেপ করত না। কারণ একদম নিরুপায় ছাড়া আমরা আমেরিকান নাগরিকদের পেছনে লাগিনা।

–যদি দয়া করে মেয়েটার সম্বন্ধে কিছু বলেন।

— একমুখ ধোয়া ছেড়ে বিরক্ত মুখে বলল, সত্যি কথা বলতে কি মেয়েটা ছিল একটা গনিকা। আসল কথা কি জানেন এই রিফিউজি মেয়েগুলো এখানে এসে পেটের ভাতের রোজগার করতে এই আদিম এবং সহজতম বৃত্তিটাই বেছে নেয়। আমরা আস্তে আস্তে এটা কমাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু কাজটা কি অত সহজ?

–মেয়েটা কেন খুন হয়েছিল, সে ব্যাপারে খোঁজখবর করতে এসেছি।

ম্যাকার্থী মাথা নেড়ে বলল, এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারবোনা। সামনে একগাদা ফাইলের দিকে চেয়ে বলল, আমি যা জানাবার মিঃ রেটনিককে জানিয়ে দিয়েছি। নতুন করে আপাততঃ আমার কিছু জানানোর নেই।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

-ঠিক আছে ধন্যবাদ। একটু ঘুরে দেখি কিছু জানতে পারি কিনা।

–দেখুন, তবে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে।

সামনের কাগজগুলো নিজের দিকে টেনে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করল।

যদি আমার কিছু করার থাকে। ওর সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে এলাম।

কুইন্স রোড এখন বেশ ব্যস্ত। প্রায় সাড়ে ছটা বাজে। এখন আমেরিকান কনস্যুল খোলা পাব কিনা সন্দেহ আছে। নতুন কোন সংবাদ পেতে হলে আমাকে নিজেকেই সবদিক খুঁজে দেখতে হবে। কিন্তু কোন্ জায়গা থেকে শুরু করব, সেটা ঠিক করতে আমার অসুবিধা হচ্ছে।

আধঘন্টার মত শহরটা ঘুরে দেখলাম। এখানকার লোকজন, আবহাওয়া খানিকটা ভাল লেগে গেল আমার। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম কিছু পান করা যাক।

ওয়াঞ্চাই বেলাভূমির বিশাল এলাকা জুড়ে ছোট ছোট বার। আমি একটা বড়সড় বার দেখে ঢুকে পড়লাম। বক্স-এ খুব হৈ-চৈ গানের বাজনা বাজছে। অনেক আমেরিকান খালাসী এখানে, বীয়ার খাচ্ছে। চীনারা নিজেদের ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা বলছে। লম্বা একটা বেঞ্চে একগাদা চীনা মেয়ে নিজেদের মধ্যে কলকল করে কথা বলছে আর মাঝে মাঝে খুব জোরে হেসে উঠছে। ওয়েটার এল। আমি স্কটআর কোক-এর অর্ডার দিলাম। ছেলেটা সেগুলো দিয়ে যেতেই দেখি আমার সামনের চেয়ারে কোণা থেকে একটা মাঝবয়সী চীনা মহিলা এসে বসল।

–শুভসন্ধ্যা। আমার শরীরটা তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে একবার দেখে নিয়ে বলল, আপনি কি এই প্রথম হংকং-এ বেড়াতে এসেছেন?

-হ্যাঁ। আমি বললাম।

—আমি যদি আপনাকে সঙ্গ দিই, কিছু মনে করবেন?

–মোটই না। আপনার জন্যে কি পানীয় নোব বলুন।

–শুধু একগ্লাস দুধ। মহিলাটি হেসে বলল।

আমি ওয়েটারকে হাতের ইশারায় ডাকতে ও যেন বুঝে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এক গ্লাস দুধ দিয়ে গেল।

–এখানকার খাবার খুব ভাল, খিদে পেলে খেয়ে নিতে পারেন। দুধে চুমুক দিল।

না, এত তাড়াতাড়ি আমি খাইনা। আপনি দুধ ছাড়া অন্য কিছু কড়া পানীয় খাবেন না?

না। আপনি কি সেস্টারে উঠেছেন? ওটাই এখানকার সবচেয়ে ভাল হোটেল।

-হ্যাঁ। সেরকমই তো শুনেছি। আমার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনার কোন সুন্দরী মেয়ে লাগবে না। আমার হাতে অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে। ওদের

সুন্দর ফিগার। আপনি বললেই আমি একটা ফোন করে দেব ওরা এখানে চলে আসবে আপনার যাকে পছন্দ হবে বলে দেবেন, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

ধন্যবাদ। আমার এখন দরকার নেই। আচ্ছা এই মেয়েদের জোগাড় করতে আপনার অসুবিধা হয়না?

মহিলা হাসল। অসুবিধা? হয়, তবে মেয়ে জোগাড় করতে নয়। এখানে অনেক মেয়ে আছে যারা অল্প পয়সার বিনিময়ে পুরুষদের মনোরঞ্জন করে থাকে।

সেলেশিয়াল হোটেল থেকে এই বার এর দূরত্ব কয়েকশো গজ। খুব সঙ্গত কারণেই আমার মনে হল, এই মহিলাই হয়তো স্থানীয় গনিকাদের নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং জো-অ্যানকে চিনতে পারে। বললাম, আমার এক বন্ধু গত বছর এখানে এসেছিল। একটা মেয়েকে তার খুব ভালো, লেগেছিল। তার নাম জো-অ্যান। তার সঙ্গে আমার দেখা করার ইচ্ছে আছে। আপনি তাকে চেনেন?

কয়েক মুহূর্ত চেয়ে একটা অবাক হবার ছাপ দেখলাম। তারপর টেবিলে টোকা মেরে বলল, চিনি। নিশ্চয়ই চিনি। আপনি বলেন তো এখুনি টেলিফোন করতে পারি। ওকে আপনার পছন্দ হবেই।

আমি আমার অবাক হবার ছাপ লুকোতে চেষ্টা করে বললাম, হ্যাঁ, টেলিফোন করুন না।

–আমার মেয়েদের মধ্যে ও সবচেয়ে সুন্দরী। তবে ও বাড়িতে ওর মা বাবার সঙ্গে থাকে। তাই ওর সঙ্গে একটা হোটেলে যেতে হবে। আপনি ওর জন্যে তিরিশ হংকং

ডলার, ঘরের জন্যে দশ হংকং ডলার আর, একটু হেসে বলল, আমার জন্যে মাত্র তিন হংকং ডলার দিন।

–ঠিক আছে। তারপর হেসে বললাম, আমি কি করে বুঝবো যে এই মেয়েটি জো-অ্যান। ওতো অন্য কেউ হতে পারে?

আমাকে খুব নিবিষ্টভাবে দেখে বলল, আপনি তামাশা করছেন? ওতো জো-অ্যান। তাছাড়া আর কে হবে?

–ঠিকই তো। আমি তামাশা করছিলাম।

আমি একটা টেলিফোন করে আসি। দেখলাম মহিলা কাউন্টারের পাশে যেখানে টেলিফোন থাকে, সেখান থেকে ফোন করছিল।

ইতিমধ্যে একজন আমেরিকান খালাসী এসে ওর কাঁধে হাত রাখল। ও হাত সরিয়ে চুপ করতে বলল। লোকটা আমাকে দেখে চোখ টিপল, আমিও পাল্টা চোখ টিপলাম। মহিলা রিসিভার রেখে দিল। বার-এর সকলে বুঝল আমি একটা মেয়ে বুক করলাম। এটা এখানে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা আর সকলেই এতে খুশী। মহিলাটি আমার কাছে এসে বলল, দশ মিনিটের মধ্যে ও আসছে। ও এলে আপনাকে জানিয়ে দেব।

মিনিট পনের পরবার-এর দরজা খুলে একটা চীনা মেয়ে ঢুকল। বেশ লম্বা, স্বাস্থ্য ভাল। পরনে কালো-সাদা ডোরা ইউরোপীয়ান পোষাক। লাল ফিতের হ্যান্ডব্যাগ। মেয়েটা খুবই আকর্ষণীয়। মেয়েটা চীনা মহিলার দিকে তাকাতে সে চোখ দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিল।

ও আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে এল। খালাসীগুলো সিটি মারল। ও বেশ গর্বিত ভঙ্গিতে ওদের দিকে হাসি ছুঁড়ে দিয়ে আমার কাছে এসে বসল।

–হ্যালো। তোমার নাম কি?

নেলসন। তোমার নাম?

–জো-অ্যান।

-জো-অ্যান কি? আমি বললাম। মেয়েটা টেবিলে রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে নিয়ে বলল, কী আবার। জো-অ্যান শুধু।

–উয়ং-চিয়াং নয়?

মেয়েটা চট করে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, হ্যাঁ ওটাই আমার নাম। তুমি জানলে কি করে?

ও মিথ্যে কথা বলছে বুঝেও বললাম, গতবছর আমার এক বন্ধু এখানে এসেছিল, সে তোমার কথা খুব বলেছে।

–আমি খুব খুশী। বলে মেয়েটা তার ঠোঁটের মাঝখানে সিগারেটটা রাখল। আমি আগুন। দিলাম। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আমাকে তোমার পছন্দ?

নিশ্চয়ই।

চল তাহলে আমরা যাই।

চল।

–আমাকে তিন ডলার দাও, মাদামকে দিতে হবে।

আমি ওকে তিন ডলার দিলাম। সেই মহিলা আমাদের এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল। টেবিলের কাছে এসে বলল, ওকে পেয়ে খুশী হয়েছেন তো?

নিশ্চয়ই। কে না হত?

ওর কাছ থেকে তিন ডলার নিয়ে বলল, আবার আসবেন। আমাকে এখানেই পাবেন।

মেয়েটা আগে আগে। আমি পেছনে যাওয়ার সময় খালাসীগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালাম। ওদের একজন আঙুল দিয়ে একটা বাজে ইঙ্গিত করল। সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

–আমি একটা পরিষ্কার হোটেল জানি। ও বলল।

–আমিও জানি। চলো সেলেশিয়াল এম্পায়ার হোটেলে আমি থাকি, সেখানে চলল। আমি বললাম।

–আমার হোটেলটা আরও ভাল।

–ঠিক আছে, আমারটাতেই চলোনা। বলে ওর কনুই ধরে কোলাহলমুখর রাস্তায় ঠেলে দিলাম। আমার হোটেলের দিকে হাঁটা দিলাম।

মেয়েটা গায়ে গা ঠেকিয়ে চলতে লাগল। ওর চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ, দৃষ্টিটা উদাসীন। গায়ে দামী পারফিউমের গন্ধ বেরোচ্ছে। হোটেলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ও পেশাদারী কায়দায় ওর নিতম্ব দোলাচ্ছিল। আমার চোখ যেন বেশী করে সেদিকেই চলে যাচ্ছিল।

বৃদ্ধ রিসেপশন ক্লার্ক আমাদের চোখ চেয়ে একবার দেখে আবার ঝিমোতে লাগল। প্যাসেজ দিয়ে এগোতেই দেখি লেইলা ওর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নেলপালিশ লাগাচ্ছে। আমি ওকে অবজ্ঞা করে দরজা খুলে মেয়েটাকে ঢুকিয়ে হুড়কো দিলাম। মেয়েটা ঢুকেই আমাকে বলল, তুমি যদি আমাকে পঞ্চাশ ডলার দাও, তবে আমি তোমাকে খুব ভালভাবে আনন্দ দেব।

মেয়েটা ওর ফ্রকের চেন খুলে ফেলল। আমি বাধা দেবার আগেই ওর দেহের উর্দ্ধাংশের পোষাক খুলে ফেলল।

–একটু আরাম কর। আমার তাড়াহুড়োকিছু নেই। পকেট থেকে ম্যানিব্যাগ বার করতে করতে বুলোম। আমি জো-অ্যানের ফটোটা বের করে ওকে দিলাম। ওর ফর্সা, গোলগাল মুখে হতবুদ্ধি ফুটে উঠল। তারপর চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এটা কি?

–জো-অ্যান-উইং-চিয়াং এর ফটো। ও আস্তে আস্তে উঠে জামাকাপড় পড়ে বিরক্তি ভরে বলল, আমি কি করে জানব যে তোমার কাছে ফটো আছে। মাদাম তত বলল, ওকে কেমন দেখতে তুমি নাকি ওকে চেনো।

–তুমি একে চেন?

–বিছানায় ওর ভারী নিতম্ব পেতে বসল।

না আমি চিনি না। অধৈর্ধের স্বরে বলল, তুমি কি আমায় টাকাটা দেবে?

আমি পাঁচটা দশ ডলারের মোট ওকে দেখিয়ে বললাম, মেয়েটা একটা আমেরিকান ছেলেকে বিয়ে করেছিল, তার নাম হেরম্যান জেফারসন। হেরম্যানকে তুমি চিনতে?

একটু হেসে মেয়েটা বলল, হ্যাঁ একবার ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তারপর আবার জো-অ্যানের ফটোটার দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু একে এমন দেখাচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে,ও মরে গেছে?

–হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছে। ও মারা...যেন ওর হাতে কিছু কামড়ে দিল। তাড়াতাড়ি ফটোটা। ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মরা লোকের ছবি দেখলে দিন খারাপ যায়। আমার টাকাটা দিয়ে দিলে চলে যেতাম।

আমি তখন হেরম্যানের ফটোটা ওর মুখের সামনে ধরে বললাম, এটাই তো ওর স্বামীর ফটো?

মেয়েটা এক ঝলক ফটোটা দেখে বলল, না, আমার ভুল হয়েছে। আমি একে কখনও দেখিনি। আমার টাকাটা দিলে চলে যাই।

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ফালতু সময় নষ্ট হচ্ছে। ও আমাকে কিছু বলবে না। ওকে টাকাগুলো দিয়ে দিলাম। ও ব্যাগে টাকাগুলো রাখতে রাখতে বলল, আমি ওর সম্বন্ধে কিছু জানিনা। টাকাটার জন্যে ধন্যবাদ। দরজার হুড়কো খুলে ও বেরিয়ে গেল।

ভাবলাম ফালতু টাকাটা গেল। আবার অন্য জায়গায় খোঁজ করতে হবে। আমার নিজের টাকা হলে কষ্টটা আরো বেশী হতো। যেহেতু জেফারসনের টাকা খরচ করছি, তাই গায়ে বেশী লাগল না।

.

২.২

একটু গড়িয়ে উঠে পড়লাম। খিদে পাচ্ছে। ঠিক করলাম বাইরে গিয়ে কিছু খেয়ে আসি। দরজা খুলতেই দেখি লেইলা আগের পোষাক পরিবর্তন করে উদাস দৃষ্টিতে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উজ্জ্বল লাল আর সোনালী পোষাক পরেছে। চুলে খোঁপা তাতে ফুলের রিং লাগিয়ে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

–মেয়েটাত বেশীক্ষণ থাকল না। ও বলল, কী ব্যাপার। তাছাড়া আমি থাকতে ওকে নিয়ে এলে কোন্ দুঃখে?

একটা কাজের ব্যাপারে শুধু কয়েকটা কথা বলার জন্যে ওকে এখানে এনেছিলাম।

কী কথা? ওর কণ্ঠে সন্দেহ।

–এই এটা-সেটা। ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

বেঁটে হলেও ওকে খুব আকর্ষণীয় লাগছে। বললাম, চলো দুজনে কোথাও ডিনার করে আসি।

ওর সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল।

ও তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ঘরে ঢুকে ওর হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে চলে এল। বলল, খুব ভাল কথা। চল তোমাকে আমি একটা ভাল রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাব। আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমরা অনেক কিছু খাব কিন্তু তোমার বেশী খরচাও হবেনা। ও প্রায় লাফাতে লাফাতে প্যাসেজ পেরিয়ে সিঁড়ির মুখে চলে এল। রিসেপশন ক্লার্ক রোগা হাতে বেশ তাড়াতাড়ি, একটা ক্যালকুলেটরে হিসাব কষতে ব্যস্ত। বৃদ্ধ আমাদের দিকে তাকালনা।

লেইলা রাস্তা পেরিয়ে একটা ট্যাক্সির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা ফেরি পর্যন্ত একটা ট্যাক্সি নিয়ে যাব। রেস্তোরাঁটা ওদিকে কউলুন-এ।

ট্যাক্সি করে ফেরিঘাটে এলাম। একটা ভীড় বোটে চাপলাম। সারাক্ষণ লেইলা বকর বকর করে গেল। চীনেরা নাকি মুভি দেখতে ভালবাসে। সত্যিই, আমি দেখলাম একটা শো-হাউসের সামনে ভীষণ ভীড়।

ওপারে পৌঁছে লেইলা আমাকে নাথান রোড ধরে রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে লাগল। এই হাঁটাতে ওর খিদে বেশ বাড়বে। ফুটপাতের গা বেয়ে অসংখ্য মানুষের ভীড়ে আমার হাঁটতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। কউলুনের এই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা হল। এত বিচিত্র রঙের নিওন আলোর বিজ্ঞাপন আমি কোথাও দেখিনি।

অবশেষে রেস্তোরাঁতে পৌঁছলাম। রেস্তোরাঁর বাইরেটা আলোকিত এবং বেশ ভীড়। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা নর্দমার ধারে খেলা করছে।

চল আমরা এখানেই খুব ভাল খাবার পাই। রেস্তোরাঁর দরজা খুলে ধরল লেইলা। সঙ্গে সঙ্গে গমগমে, বেশ উত্তেজিত কিছু চীনা স্ত্রী-পুরুষের গলার আওয়াজ কানে এসে ধাক্কা মারল। কিন্তু যারা খাচ্ছে তাদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। প্রত্যেকটা কেবিনের সামনে ভারী পর্দা ঝোলানো। বেশ জোরে একটা গান বাজছে আর সেই সঙ্গে টুংটাং কাপ-ডিসের আওয়াজ।

রেস্তোরাঁর মালিক একটা কেবিনের পর্দা তুলে ধরে লেইলার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমরা ঢুকে যেতে পা নামিয়ে চলে গেল।

লেইলা বেশ আরাম করে বসে বসে বলল, আমি অর্ডার দেব। প্রথমে আমরা চিংড়িমাছ ভাজা খাব, তারপর একটা স্যুপ। তারপর বেগার-চিকেন–এটা এখানে খুব ভাল করে। তারপর দেখব, আর কী খাওয়া যায়। তবে চিংড়িমাছটা আগে খাব।

ওয়েটারকে দ্রুত ক্যান্টনীজ ভাষায় অর্ডার দিয়ে টেবিলে রাখা আমার হাতটা ওর হাতে তুলে নিল।

–আমি আমেরিকান ভদ্রলোকদের খুব ভালবাসি। এদের বেশ পৌরুষ আছে আর বিছানায় এদের আমার ভীষণ ভাল লাগে। তাছাড়া এদের হাতে পয়সাও তো প্রচুর।

–তুমি যা যা বললে তার কোনটাই আমার নেই। পরে কিন্তু হতাশ হতে হবে। তুমি এখানে কতদিন আছো?

–তিন বছর। আমি একটা রিফুইজী, ক্যান্টন থেকে এসেছি। আমার খুড়তুতো ভাইয়ের নৌকো করে ম্যাকাউ গেছি। সেখান থেকে আমি এই হংকং-এ এসেছি।

ওয়েটার আমাদের গরম গরম চীনা মদ এনে দুটো গ্লাসে ঢেলে দিল। ঐ কড়া মদে চুমুক দিতে দিতে বললাম, তুমি বোধহয় জো-অ্যান-উইং-চিয়াংকে চিনতে পার। ঐ মেয়েটাও তো একটা রিফিউজী ছিল।

ও একটু অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ ওকে আমি ভালভাবে চিনি। তুমি ওকে চিনলে কি করে?

না, ওকে আমি চিনিনা।

এই সময়ে ওয়েটার একটা বড় পাত্র করে বড় বড় সোনালী রং-এর চিংড়িমাছ ভাজা দিয়ে গেল। কাঠি দিয়ে একটা চিংড়ি গেঁথে সেটাকে স-এ ডোবাতে ডোবাতে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু তুমি ওর নামটা জানলে কি করে?

–আমার দেশের বাড়ির এক বন্ধুর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল। তোমার সঙ্গে ওর কখনও আলাপ হয়েছিল? ওর নাম হেরম্যান জেফারসন। আমি বললাম, একটা চিংড়ি কাঠি দিয়ে তুলতে গিয়ে সেটা টেবিলক্লথের ওপর পড়ে গেল। আবারনড়বড় করতে করতে চেষ্টা করে সেটা গেঁথেসাবধানে মুখে তুললাম। ভীষণ সুস্বাদু।

-হা নিশ্চয়ই। ও খুব চটপট অবিশ্বাস্য দ্রুত হাতে খাচ্ছে।বলল, জো-অ্যান আর আমি একই সঙ্গে ক্যান্টন থেকে পালিয়ে আসি। ওর ভাগ্য ভাল ছিল তাই একজন আমেরিকানকে ও বিয়ে করে যদিও এখন সে মৃত।

ওয়েটার এবার ফ্রায়েড রাইস দিয়ে গেল। ডিম ভাজা, হ্যাঁমের টুকরো, চিংড়ি ভাজা এইসব দিয়ে মেশানো, সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। লেইলা খানিকটা ওর পাত্রে নিয়ে তাড়াতাড়ি খেতে লাগল। আমি ওর সঙ্গে পেরে উঠছিনা।

–ও কি জো-অ্যানকে নিয়ে তুমি যে হোটেলে আছ সেই হোটেলে থাকত? আমি প্রশ্ন করলাম।

কাঠি দিয়ে রাইস মুখে তুলতে গিয়ে টেবিলে ছড়ালাম।

লেইলা মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

ওর প্লেটের চিংড়িভাজা শেষ। ফ্রায়েড রাইস অর্ধেক উদরস্থ হয়েছে। খুব কম সময়ের মধ্যে বেশী খাবার পেটে চালান দেওয়ার কায়দাটা ভালই রপ্ত করেছে।

–বিয়ের পর তিনমাস ওরা আমার পাশের ঘরটায় থাকত। তারপর হেরম্যান চলে যায়। একপাত্র সুন্দর হাঙরের সুপ এলো।

–ও চলে গেল কেন? আমি প্রশ্ন করলাম। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, বোধহয় অ্যানকে আর প্রয়োজন ছিল না তাই।

চামচে করে স্যুপ খেতে খেতে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? ওকে প্রয়োজন ছিল না কেন?

লেইলা আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, ও তো জোকে বিয়ে করেছিল শুধু ওর পয়সায় খেয়ে পরে থাকার জন্যে।তারপর যখন নিজে রোজগার করতে আরম্ভ করল তখন আর ওকে কি প্রয়োজন?

–মেয়েটা ওকে কিভাবে খাওয়াত পাত? উত্তর কি আসবে জেনেই জিজ্ঞেস করলাম।

কী করে আবার, এই আমার মতো পুরুষদের মনোরঞ্জন করে। খুব শান্তভাবে ও তাকাল। এছাড়া আর আমাদের পয়সা রোজগারের অন্য রাত কোথায়?

তারপরেই পর্দার ফাঁকে ওয়েটারকে দেখা গেল হাতে একটা মাদুর। আর মাদুরটা মেঝেতে বিছিয়ে একটা বড় পাত্রে বিশাল আকারের উটপাখীর ডিমের মত কিছু একটা এনে সেটা মাদুরে রাখল।

এবার লেইলা আমাকে বোঝাতে লাগল, প্রথমে মুরগীটাকে নানারকমের মশলা মাখিয়ে পদ্মপাতায় জড়িয়ে, তার চারপাশে মাটি লেপে সেটাকে পাঁচঘণ্টা ধরে পোড়ানো হয়।

জিনিষটা যে কি, আমার বোধগম্য হল। ওয়েটার ছেলেটা একটা হাতুড়ি দিয়ে ডিমটা ফাটাতেই তার ভেতর থেকে সুগন্ধীযুক্ত পদ্মপাতা জড়ানো মুরগীটা বেরোল। ছেলেটা তাড়াতাড়ি পদ্মপাতা ছাড়িয়ে মাংসটা সেই পাত্রে রাখল। মাংসটা এত ভাল তৈরী হয়েছে যে হাড় থেকে মাংসটা আপনা-আপনি ছেড়ে গেল। ছেলেটা মাংসগুলো আমাদের পাত্রে যত্নের সঙ্গে চামচে করে তুলে দিল।

লেইলার কাঠি আবার দ্রুতবেগে ওঠানামা করতে লাগল। আমি খেতে থাকলাম। এত সুস্বাদু খাবার আমি আগে কখনও খাইনি। ও খানিকটা মাংস মুখে পুরে বলল, এই হল বেগার চিকেন।

আমি ওর খাওয়া শেষ না হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভাবলাম এখন ওকে প্রশ্ন করে ওর খাওয়ার মনোসংযোগ নষ্ট করা।

আমি ততক্ষণে হাত গুটিয়ে নিয়েছি। ও আবার মাশরুম, বাঁশের কোঁড়কের তরকারী আর জলপাই কেকের অর্ডার দিল। আমি সিগারেট ধরিয়ে আরও মিনিট কুড়ি ধরে ওর খাওয়া দেখছিলাম। অবশেষে ওর চোখে-মুখে তৃপ্তির ছাপ দেখতে পেলাম। এই পরিমাণ খেয়েও যে এত সুন্দর ফিগার রাখতে পারে, সত্যিই তাকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়।

ও আমার থেকে একটা সিগারেট চেয়ে দুটো ঠোঁটের মাঝখানে রাখল আর আমি ওটা ধরিয়ে দিলাম। ও একমুখ ধোয়া ছেড়ে বলল, চুল এবার আমরা হোটেলে ফিরে যাই।

ওখানে আমরা একটু ভালবাসাবাসি করব। ওর হাসিতে কামনার স্পষ্ট আমন্ত্রণ। ও বলল, এই সুন্দর খাওয়া দাওয়া করার পর ওটাই ভাল লাগবে।

আমি বললাম, এই তো সবে সন্ধ্যে, এখন তো সারারাত পড়ে আছে, তাই না! তুমি বরং হেরম্যান আর অ্যানের সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলো। তুমি বলছিলে অ্যানকে বিয়ে করার পর হেরম্যান রোজগার করত। ও কী করত?

লেইলার মুখ দেখে বোঝা গেল, হেরম্যানকে নিয়ে আলোচনায় ও বিরক্তিবোধ করছে।

–সে আমি জানি না। একদিন দেখলাম ও ঘরে বসে একা একা কাঁদছে। জিজ্ঞেস করায় ও বলল, হেরম্যান ওকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন ও নিজে রোজগার করছে সুতরাং জো-কে আর দরকার নেই।

-রোজগারটা কীভাবে করত? সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলেছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

–কেন বলবে? তাছাড়া আমার জানারই বা কি দরকার?

–হেরম্যান কি আবার ফিরে এসেছিল?

–ঐ মাঝে মাঝে এসে রাত কাটিয়ে চলে যেত। লেইলা মুখে একটা ভঙ্গী করে বলল।

ও চলে যাবার পর অ্যান কি করত?

কী আবার করবে। আগে যা করত তাই! ভদ্রলোকদের মনোরঞ্জন। তাছাড়া আর কী? পেটের জন্যে তো পয়সা দরকার?

-কেন? ও যখন হেরম্যানের স্ত্রী ছিল, তখন হেরম্যান যা রোজগার করত, তার কিছু তো দিত?

কিছু দিত না।

–জো-অ্যানকে ছেড়ে যাবার পর হেরম্যান কোথায় থাকত? তুমি জান?

-রিপালস্ উপসাগরের তীরে এক চীনা জুয়াড়ীর বিরাট অট্টালিকা ভাড়া নিয়েছিল। জায়গাটা আমি দেখেছি। খুব সুন্দর, বড় বাড়ি দুধের মত সাদা রঙ। একটা ছোট ঘাট ও বোট ছিল।

–জো কি সেখানে কখনও গিয়েছিল?

না, না। হেরম্যান ওকে কখনও যেতে বলেনি। ওয়েটার এসে বিল দিয়ে গেল। খাবারের দাম অবিশ্বাস্য রকমের সত্ত্বা। আমি দাম মেটালাম। লেইলা সুখী-সুখী মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি খুশী হয়েছে তো?

হু-উ। খুব। খাবারগুলো ভাল। আমি বললাম।

চল হোটেলে গিয়ে আমরা একটু আরাম করি।

হংকং-এর আবহাওয়াটাই এমনি। না চাইতেই এরা সব দিয়ে বসে থাকে। তাছাড়া আমি কখনও চীনা মেয়েকে নিয়ে শুইনি। মনে হল, অভিজ্ঞতা হলে কেমন হয়!

-ঠিক আছে। চলো হোটেলেই ফেরা যাক!

বেরিয়ে ব্যস্ত রাস্তায় নামলাম। চারিদিকে অন্ধকার নেমেছে। নাথান রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে ও বলল, তুমি আমাকে নিশ্চয়ই একটা উপহার দেবে?

আমার একটা হাত ওর দুহাতে জড়িয়ে ধরে একটা নিশ্চিন্ত হাসি হেসে লেইলা বলল।

নিশ্চয়ই, এই কথাটা আমিই তোমাকে বলব বলে ভাবছিলাম। তা বল কি নেবে?

–চল আমি দেখাব।

একটু এগিয়ে একটা বাজারে এসে পৌঁছলাম। সবকটা দোকান আলো দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। প্রত্যেক দোকানেই হাসিখুশি সেলসম্যান দাঁড়িয়ে।

আমি একটা আংটি কিনব, যেটা দেখলেই তোমার কথা মনে পড়বে। খুব দামী কিছু চাই না।

আমরা একটা জুয়েলারী দোকানে গেলাম। লেইলা একটা জেড-এরনকল আংটি পছন্দ করল। দশ মিনিট দর কষাকষির পরে লেইলা ওটা চল্লিশ হংকং ডলার থেকে পঁচিশ হংকং ডলারে রফা করল। আমি দাম দিয়ে দিলাম। তারপর আমরা হোটেলে ফিরে যাওয়া মনস্থ করলাম।

ফেরি পেরিয়ে এসে হাত তুলে যখন একটা ট্যাক্সি ডাকছিলাম, ঠিক সেই সময় লেইলা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল। আমি ট্যাক্সি ডাকতে ট্যাক্সিটা যেই আমাদের পাশে এল, দেখি তিনটে গাঁট্টাগোট্টা চীনা ছেলে কালো স্যুট পরা আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর ড্রাইভারের সঙ্গে কিছু কথা বলে আমার কাছে ভুল ইংরাজীতে মাফ চাইল, যেন আমি ট্যাক্সিটা ডেকেছি ওরা বুঝতে পারেনি। তারপর ওরা অন্য একটা ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে গেল। তারপর আমার পাশে যখন তাকালাম, দেখি লেইলা নেই। চারিদিকে তাকালাম। কোথাও নেই।

.

২.৩

মিনিট পনের এদিক-সেদিক খুঁজলাম। ফেরিঘাটে গেলাম, ওখানেও লেইলা নেই। আমার ভেতরে একটা ভয় ঘুরপাক খেতে লাগল। ট্যাক্সি ডেকে হোটেলে ফিরলাম।

রিসেপশনে সেই বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম, লেইলা ফিরেছে?

কোনরকমে একটা চোখ খুলে বলল, নো স্পিক ইংলিশ। আবার চোখ বুজল। আমি ঘরে এলাম। লেইলার ঘরের দরজার হাতল ঘুরিয়ে ওর ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দেখলাম, লেইলা কোথাও নেই।

আমার ঘরে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভীষণ গরম আর দমচাপা ভাব নিয়ে জেগে উঠলাম। সূর্যের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। ঘড়ি দেখলাম। আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। তারপরেই গেলাম লেইলার ঘরের দিকে। ফাঁকা ঘর। একটা শিরশিরে ভয় আমার মেরুদণ্ড বেয়ে উঠতে লাগলো। আমার মনে হল, ও আমাকে ছেড়ে স্বেচ্ছায় পালিয়ে যায়নি ওকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওর যে খারাপ কিছু ঘটেছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। অনুমান করলাম, কেউ হয়তো জানতে পেরেছে যে লেইলা আমাকে অনেক কিছু বলে দিচ্ছিল।

মনে মনে স্থির করলাম এখন কী করা উচিত। পরিষ্কার একসেট জামাপ্যান্ট পরে দরজায় তালা লাগিয়ে সিঁড়ির কাছে এলাম। একটা চীনা ছেলে, সম্ভবতঃ ঐ বৃদ্ধের নাতি কাউন্টারেসে আছে।

লেইলা গতকাল রাত্রে ওর ঘরে ফেরেনি। বলতেই ছেলেটা কেমন বিব্রত বোধ করে মাথা নোয়াল। সম্ভবতঃ কিছু বোঝেনি।

নীচে এসে একটা ট্যাক্সি ডেকে পুলিশ হেডকোয়ার্টার-এ এলাম।

সৌভাগ্যক্রমে ম্যাকার্থীকে পেয়ে গেলাম। দেখি ও গাড়ি থেকে নামছে। ও আমাকে পুলিশ ক্যান্টিনে নিয়ে গেল। দু-মগ কড়া চা নেওয়া হল। আমি ওকে গতরাতের পুরো ঘটনাটা বললাম।

ও ব্যাপারটাকে কোন পাত্তাই দিলনা। ওর ঠাণ্ডা চাউনি এবং এটা কোন ব্যাপারই নয় ধরণের মুখভঙ্গি আমার রক্তচাপ বাড়িয়ে দিল।

–কিন্তু মেয়েটার কিছু একটা হয়েছে। এতে কোন ভুল নেই। এক সময় আমার পাশে ছিল, হঠাৎ দেখি নেই। আর হোটেলেও ফিরে আসেনি। আমার চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে নিবৃত্ত করলাম। ও ওর পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলল, একটা কথা বলি শুনুন, এ নিয়ে এত মাথা ঘামাবেন না। গত পনের বছর এখানে এই মেয়েগুলোকে নিয়ে কাজ করছি। ওরা আজ এখানে কাল সেখানে। হয়তো আপনার চেয়ে শাঁসালো পাটি দেখে কেটে পড়েছে।

আমি আরও কিছুটা চা খেয়ে অসহায়ের মতো বললাম, কিন্তু আমার ব্যাপারটা আলাদা। হোটেলে ফেরার সময় ও আমাকে কতকগুলো কথা বলছিল।ওকে মনে হয় কিডন্যাপকরা হয়েছে।

কী কথা বলছিল? ম্যাকার্থী জিজ্ঞেস করল।

–আমি একটা খুনের কিনারা করার চেষ্টা করছিলাম। ও আমাকে অনেকগুলো খবর দিচ্ছিল।

ম্যাকার্থী তখন একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, যে লোকটা আমেরিকায় খুন হয়েছে, সে ব্যাপারে ও এখানে আপনাকে কি খবর দেবে?

ও আমাকে বলছিল, হেরম্যান জেফারসন রিপালস্ উপদ্বীপের কিনারায় একটা অট্টালিকা ভাড়া নিয়েছিল।ও নাকি বিয়ের তিনমাস পর থেকে অনেক পয়সা রোজগার করছিল আর এজন্য ওর স্ত্রী জো-অ্যানকে ছেড়ে চলে যায়।

ম্যাকার্থী হেসে বলল, আপনাকে কি বলব বলুন তো? একটা বেশ্যা কি বলল, আর আপনি সেটা বিশ্বাস করছেন?

বুঝলাম। কিন্তু রাত্রে শুধু শুধু ও আমাকে বোকা বানাচ্ছিল?

–একটা বেশ্যার কাজই তো রাত্রে বাইরে কাটানো। ম্যাকার্থীর সোজা জবাব।

–আপনার এমন আমেরিকানদের জানা আছে কি যারা রিপালস্ উপদ্বীপে থাকে?

বেশ কয়েকজন।

–আপনি একটু খবর নেবেন, ওখানে হেরম্যান কোন বাড়িভাড়া নিয়েছিল কিনা।

নেয় নি, নিলে জানতে পারতাম।

–তাহলে মেয়েটা আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছিল?

–ঠিক তাই। আর সেটাই আমার বক্তব্য, আমি আর শুধু শুধু সময় নষ্ট না করে উঠে পড়লাম। বললাম, ধন্যবাদ, আমি আবার আসব।

–আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশী হব।

একটা ট্যাক্সি ডেকে হোটেলে ফিরে দেখি সেই বৃদ্ধ আবার নিজের জায়গায় এসে গেছে। আমাকে দেখে মাথা নামিয়ে নিল। কিন্তু আমার ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার ইচ্ছে

হল। কিন্তু ও যে ইংরেজী বোঝে না। আমার এয়ারপোর্টের সেই ইংরেজী বলিয়ে ওয়ং-এর কথা মনে পড়ল। ও নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আর ওর কার্ডটা আমার কাছে আছে।

আমার ঘরে এলাম। লেইলার ঘরের দরজার হাতল ঘুরিয়ে ধাক্কা মারলাম। তালা দেওয়া। টোকা মেরে কান পেতে কোন শব্দ পেলাম না। নিজের ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দরজায় আস্তে টোকা মারার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল, ঘড়িতে দশটা বেজে কয়েক মিনিট। দরজা খুললাম। সেই চীনা ছেলেটা দুর্বোধ্য কিছু একটা বলে প্যাসেজ দেখাল। আমি ওকে অনুসরণ করে রিসেপশন কাউন্টারে এলাম। ম্যাকার্থী আমাকে ফোন করেছে।

ম্যাকার্থী অপর প্রান্ত থেকে বলল, আপনি যে মেয়েটার কথা বলেছিলেন, তাকে আপনি জেড পাথরের একটা আংটি কিনে দিয়েছিলেন, তাইতো সকালে বললেন? আমার হাত পা শক্ত হয়ে উঠল।

–হ্যাঁ একটা নকল জেডের। আমি বললাম।

–আপনি শিগগীর একটা ট্যাক্সি নিয়ে চ্যাথাম রোড পুলিশ স্টেশনে চলে আসুন। জায়গাটা কউলুন-এ। ওরা একটা মেয়ের কথা বলছে, তার হাতে জেডের আংটি রয়েছে।

–ওকি মারা গেছে? আমি প্রশ্ন করলাম।

-হ্যাঁ, ওর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ওখানে সার্জেন্ট হ্যামিশের সঙ্গে দেখা করে ওকে সনাক্ত করতে পারেন।

উনিও কি স্কটিশ? আমি কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞেস করলাম।

–ঠিকই ধরেছেন, এখানে পুলিশ ফোর্সে প্রচুর স্কটিশ আছে।

হু, স্কটল্যান্ডবাসীদের জন্যে এটা একটা সুখবর।

মিনিট চল্লিশ বাদে চ্যাথাম রোড পুলিশ স্টেশনে পৌঁছলাম। লবিতে ফ্রেমে বাঁধানো একগাদা মর্গে তোলা চীনা স্ত্রী-পুরুষের ফটো। নীচে ইংরেজী আর চীনা ভাষায় এদের সনাক্ত করার আবেদন।

ঢোকার মুখে একজন যুবক সার্জেন্ট, মুখ শক্ত, টানটান, মাথায় ঢেউ খেলানো চুল। বসে ফাইলে কিছু কাজ করছে। ইনিই সার্জেন্ট হ্যামিশ। আমি নিজের পরিচয় দিয়ে লাশটা দেখতে চাইলাম।

ক্ষয়ে যাওয়া কম দামী পাইপে তামাক ভরতে ভরতে, আমার কথায় কোন আগ্রহ প্রকাশ না করে বলল, হ্যাঁ, কাল রাত দুটো নাগাদ প্রণালী থেকে একটা ফেরি স্টীমার ওর লাশটা দেখতে পায়। শরীরে বিশেষ কিছুই নেই।

সার্জেন্ট উঠে দাঁড়াল।

তারপর সার্জেন্ট গল্পচ্ছলে বলল, এই লোকগুলো সবসময় নিজেদের মারছে। রোজ অন্ততঃ আধডজন করে এদের লাশ পাচ্ছি। চীনারা মনে হয় নিজেদের জীবন নিয়ে একদম চিন্তা করেনা।

প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে মর্গের উঠোনে পড়লাম। ভেতরে দেখি বেশ কয়েকটা লাশ ঢাকা দেওয়া তার মধ্যে একটা লাশের রবারের চাদরের কোণা তুলে হাতড়ে-হাতড়ে একটা ফ্যাকাসে হাত বের করল। হাতের আঙুলে নকল জেডের একটা আংটি।

সার্জেন্ট হ্যামিশ খানিকটা হাল্কা গলায় বলল, ব্রেকফাস্টে শুধু ডিম আর বেকন খেয়েছি। এখন আপনি যদি এই আংটি দেখে সনাক্ত করতে পারেন, তবে এই সময়ে দৌড়ঝাঁপ-এর হাত থেকে বেঁচে যাব।

আমি আংটিটা আর ছোট পাতলা হাতটা দেখে বললাম, হ্যাঁ এই সেই আংটি।

সার্জেন্ট হাতটা চাদরের নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, ধন্যবাদ,আমি চীফ ইন্সপেকটরকে জানিয়ে দেব।

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে চাদরটা তুলে লেইলারশরীরের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল দেখলাম। ভীষণ কষ্ট অনুভব করলাম। ওকে বিদায় জানালাম।

কালকের রাতের ঘটনা সব মনে পড়তে লাগল। ওর সঙ্গে আলাপ আমার বেশীক্ষণের নয়, কিন্তু ওর ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমার মনে হল, আমি প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় একজনকে হারালাম।

ফেরি পার হবার পর দেখি আমার জন্যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের গোয়েন্দা মিঃ ম্যাকফারসন অপেক্ষা করছে। আমরা জীপে চড়ে হোটেলে এলাম। জড়ানো চীনা ভাষায় রিসেপশন্ ক্লার্ককে কিছু বুঝিয়ে লেইলার ঘরের চাবি নিল।

ম্যাকফারসন চাবি দিয়ে লেইলার ঘর খুলে ভেতরে ঢুকে পেশাদারী চোখে সব কিছু দেখতে লাগল। কাপবোর্ডে তিনটে জামা আর ড্রয়ারের ওপর একসেট অন্তর্বাস পড়ে আছে। আমি প্যাসেজে দাঁড়িয়ে লেইলার সম্পত্তি দেখতে লাগলাম।

কাপবোর্ডের তলায় উঁকি মেরে কুঁজো হয়ে আঙুল ঢুকিয়ে খুব সাবধানে একটা টিনের পাতলা টুকরো বের করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, যা ভেবেছিতাই। জানো এটা কি? টিনের চাকতিটা দেখিয়ে আমাকে সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করল।

-না, আপনি বলুন। আমি বললাম।

সে আবার কুঁজো হয়ে কাপবোর্ডের তলা থেকে একটা আধপোড়া মোমবাতি বের করে চাকতিটা এক হাতে ধরে বলল, মেয়েটার হেরোইনের নেশা ছিল। এই নেশাতেই সপ্তাহে গড়ে আধডজন মারা যায়।

আপনি এত নিশ্চিত হয়ে বলছেন কি করে?

এই দুটো জিনিষ কারোর কাছে থাকলেই বুঝবেন হেরোইনের নেশা আছে। ম্যাকফারসন বলে চলল, কিভাবে নেশা করে জানেন? এই চাকতিটায় হেরোইন রেখে তলায়

মোমবাতি ধরে যে ধোঁয়াটা হয়, সেটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানে। আমাদের গভর্নমেন্টের সবচেয়ে বোকামীর কাজ হল আফিম খাওয়া বন্ধ করা। আরে বাবা, এইভাবে যারা আফিম খেত তাদের একটা ঘর, একটা বিছানা, আর খরচসাপেক্ষ সাজ-সরঞ্জাম লাগত। আমরা তাড়া করলে অনেকে ভয়ে পাইপ ভেঙে ফেলত। পরে আবার একটা কেনাও কষ্টসাধ্য ছিল। আমরা ভাবলাম আইন করে নেশা কমাব, আর এই নেশাখোরগুলো দেখল আফিমের বদলে হেরোইনের নেশায় একটা চাকতি আর মোমবাতি হলেই চলবে। এখন যে কোন জায়গায় বাসে, ট্রামে, সিনেমা হলে যেখানে ইচ্ছে এই বিষ টানতে পারে। একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই দেখতে পাবেন এমন-এমন জায়গা যেখানে আপনি ভাবতেও পারেন না, সেইসব জায়গায় হঠাৎ মোমবাতি জ্বলে উঠল। বুঝবেন ওখানে হেরোইন টানা হচ্ছে। আফিম বন্ধ না করলে এই নেশাখোরগুলোকে হেরোইন খেয়ে মরতে হতো না।

আমি চোয়ালে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, আপনার এই জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার জন্যে। ধন্যবাদ। তবে আমি বিশ্বাস করিনা ও আত্মহত্যা করেছে, আমার দৃঢ় ধারণা ওকে খুন করা হয়েছে এবং পরিকল্পনামাফিক ঐ দুটো জিনিষ আপনাকে ধোঁকা দেবার জন্যে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

ম্যাকফারসনের মুখের কোন ভাবান্তর হলনা। খানিকটা আমুদে গলায় বলল, চীফ বলছিলেন, আপনি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। আমি chandler পড়েছি, Hammet-ও পড়েছি। ওগুলো সব ফিকসন, এটা বাস্তব।

–ভাল কথা। আপনি যা বোঝেন সেটাই ঠিক।

খুব নিরাসক্ত গলায় ও আমাকে প্রশ্ন করল, ওকে যে খুন করা হয়েছে, এটা আপনি কেন মনে করেছেন?

–সেটা আপনাকে বোঝান আমার কম্ম নয়। যা ওর জিনিষপত্রগুলো কি করবেন? আমি বললাম।

–পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাবো, যদি কেউ দাবী করে। সস্তা স্যুটকেসে ওর জামা কাপড়গুলো ভরতে ভরতে বলল, আমরা রোজ যে পরিমাণ এই কেস নিয়ে কাজ করি, আপনি করলেও এ ব্যাপারে আর দ্বিতীয়বার চিন্তা করতেন না।

-ঠিক বলেছেন আমারও তাই ধারণা।

ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কি ধারণা আপনার?

–যে লোকেরা ওকে খুন করেছে, তারাও চায়না আপনি আর দ্বিতীয়বার চিন্তা করেন, তাই না?

ও হেসে বলল, রোজ শয়েশয়ে এই কেস ঘাঁটছি।

আমার আর ওর বকবকানি ভাল লাগছিল না। ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বললাম, যাক্ আমি এখন এখানে আরও কয়েকদিন আছি, প্রয়োজন হলে আসতে পারেন।

ম্যাকফারসন কেমন ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার সঙ্গে প্রয়োজন? কেন?

দুজনে মিলে একটা ডিটেটিভ গল্প তো পড়তে পারি।

মুখের ওপর দমাস করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

.

২.৪

আমার মনে হল এবার মিঃ জেফারসনের কিছু টাকা খরচ করার সময় হয়েছে। রিসেপশনের ঐ বৃদ্ধটাকে যদি কিছু ডলারের লোভ দেখান যায়, তাহলে ও আমাকে ম্যাকফারসনের চাইতে বেশী কিছু সময় দেবে।

ম্যাকফারসন হোটেল ছেড়ে চলে যেতে আমি কাউন্টারে গেলাম টেলিফোন করতে। অনুমতি পেলাম। ওয়ং-হপ এর নম্বর ডায়াল করতে সঙ্গে সঙ্গে ওকে পেলাম।

আমি বললাম, আমাকে মনে পড়ছে। আপনি এয়ারপোর্টে আমাকে কার্ড দিয়েছিলেন। আমার একজন দো-ভাষীর প্রয়োজন।

–এ কাজটা আমি করতে পারলে খুশী হব। উত্তর এল,–তাহলে আধঘণ্টার মধ্যে সাংহাই এ্যান্ড হংকং ব্যাংক-এর সামনে চলে আসুন।

ও সম্মতি দিতে বললাম, আমার একটা গাড়ীর দরকার হবে।

হো জানাল, আমার যা কিছুই প্রয়োজন ও খুব আনন্দের সঙ্গে তা যোগান দেবে এবং ওকেও আমি সর্বক্ষণের জন্য ইংরেজী বলিয়ে গাইড-হিসাবে পেতে পারি।

আমি ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ব্যাংকের বাইরে ওয়ং হপ-এর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিনিট দশেকের মধ্যে মিঃ হো চচকে একটা প্যাকার্ড গাড়ী চালিয়ে এল। বলল, ওকে ওয়ং বলে ডাকলেই ও খুশী হবে।

গাড়ীতে উঠে ওর পাশে বসলাম। আমি বললাম, আমি আমার হোটেলের রিসেপশান ক্লার্কের কাছে থেকে কতকগুলো খবর জানতে চাই, ও ইংরাজী জানে না। আমি একজন প্রাইভেট ইন-ভেস্টিগেটর। একটা কেসের ব্যাপারে এখানে এসেছি। ও খুশীতে ডগমগ হয়ে ওর সোনালী দাঁত বের করে হেসে বলল, এতদিন আমি ডিটেকটিভ গল্পই পড়েছি, এখন একজন ডিটেকটিভ দেখে আনন্দ পাচ্ছি।

আমি পকেট থেকে পঞ্চাশ হংকং ডলার ওর হাতে দিয়ে বললাম, আপনার সারাদিনের ফী হিসেবে এটা হবে তো? আপনাকে আমার সারাদিনের জন্যে দরকার লাগতে পারে।

ওয়ং বলল যে এতে নিজে খুশী কিন্তু গাড়ীর জন্য আলাদা আরও কিছু দিতে হবে। আমি আর দরাদরি না করে ওর প্রয়োজন অনুভব করে ওকে আরও কিছু ডলার দিয়ে, গাড়ী নিয়ে । হোটেলে এলাম। গাড়ীদাঁড় করিয়ে রিসেপশনে এলাম। কাউন্টারের বৃদ্ধ ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। আমি বললাম, ওকে বলুন আমি ওকে কতকগুলো প্রশ্ন করতে

চাই, তার জন্যে ও আমাকে সাহায্য করলে আমি ওকে পয়সা দেব। এটা এমনভাবে বলুন যাতে ও কিছু মনে না করে।

আমি ইতিমধ্যে পকেট থেকে পাঁচটা দশ ডলারের নোট বৃদ্ধকে দেখিয়ে মুড়ে রাখলাম। বৃদ্ধ লোভার্ত দৃষ্টিতে নোটগুলোর দিকে চেয়ে ওয়ং-এর মাধ্যমে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত বলে জানাল।

আমি জো-অ্যানের মর্গের ফটোটা বের করে ওয়ংকে বললাম, এটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করুন মেয়েটাকে ও চেনে কিনা।

ফটোটা একদৃষ্টে দেখে ওয়ং-এর সঙ্গে কিছু দুর্বোধ্য কথাবার্তা বলল। ওয়ং আমাকে জানাল যে, মেয়েটা এই হোটেলেই থাকত। দিন পনের আগে হোটেলের বিল না মিটিয়েই চলে গেছে। আমি কি সেই বিলটা মিটিয়ে দেব?

আমি জানালাম, না।

আরও প্রশ্ন করায় ওয়ং জানাল, মেয়েটা একটা আমেরিকানকে বিয়ে করে। সেও ওর ঘরেই থাকত। ভদ্রলোকের নাম ছিল হেরম্যান জেফারসন। দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা মোটর দুর্ঘটনায় সে মারা গেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর বিল না মিটিয়েই ও চলে যায়।

তখন আমি হেরম্যানের একটা ফটো বের করে ওয়ং-কে বললাম জিজ্ঞাসা করুন একে চেনে কিনা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফটোটা দেখে বৃদ্ধ বলল ওয়ং-এর মাধ্যমে, এই ভদ্রলোকই সেই আমেরিকান যে মেয়েটার সঙ্গে একই ঘরে থাকত।

–লোকটা এখানে কতদিন ছিল?

ওয়ং মারফৎ বৃদ্ধ জানাল মরার আগে পর্যন্ত।

এই প্রথম ও মিথ্যে বলল। লেইলা বলেছিল যে প্রায় মাস কয়েক আগে এই হোটেল থেকে ও চলে গিয়েছিল। কিন্তু এর কথানুযায়ী হেরম্যান এখানে তিন সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ওর মৃত্যু পর্যন্ত এখানে ছিল।

–কিন্তু আমি শুনেছিলাম জেফারসন এখানে মাত্র তিনমাস ছিল। তারপর স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়। আর সেটা নমাস আগের ঘটনা।

ওয়ং তারপর বৃদ্ধের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে অনেক কথা বলল। তারপর ওয়ং বলল, ও একেবারে নিশ্চিত যে আমেরিকান ভদ্রলোক মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এখানে ছিল।

আমি ভাবলাম, তবে কি লেইলা মিথ্যে বলেছিল? ওয়ংকে বললাম, বলুন লেইলা বলেছে জেফারসন এখান থেকে নমাস আগে চলে গেছে, এও বলুন ও মিথ্যে বলছে।

ওয়ং ক্যান্টনীজ ভাষায় কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালানোর পর জানাল, ও মিথ্যে বলছে না স্যার। জেফারসন রোজ গভীর রাতে আসত আর ভোরে বেরিয়ে যেত। সেই জন্য লেইলা ওকে দেখেনি আর ভেবেছে জেফারসন চলে গেছে।

–জেফারসন এখানে রোজগার করত কীভাবে? আমি একথা জিজ্ঞেস করতে উত্তর এল জানে না।

–কোন ইউরোপীয় ওর সঙ্গে দেখা করতে আসত?

–এবারও উত্তর না।

–জো-অ্যানের কোন বন্ধু ওর সঙ্গে দেখা করতে আসত?

না

আমি উত্তেজিত এবং হতাশ হলাম। কার কথা যে সত্যি ভেবে পাচ্ছিলাম না। কোন থই খুঁজে পাচ্ছি না।

জিজ্ঞেস করলাম খুব হাল্কাভাবে, আচ্ছা জো- অ্যান কি যাবার সময় কোন জিনিষপত্র ঘরে ফেলে গেছে?

-না, কিছুই রেখে যায় নি।

আমি এবার ঝাঁঝিয়ে উঠে বললাম, তাহলে কি ও চোখের সামনে দিয়ে মালপত্র নিয়ে, বিল না মিটিয়ে চলে গেল?

ওয়ং আমার কথার যুক্তি বুঝতে পেরে বৃদ্ধকে খেঁকিয়ে উঠল। খানিকটা আমতা আমতা করে বৃদ্ধ বলল যে, একটা সুটকেশ ফেলে গেছে, ভাড়া বাকী আছে বলে সেটা জমা রেখেছে।

আমি সুটকেশটা দেখতে চাওয়ায় বৃদ্ধ লেইলার পাশের ঘরের দরজা খুলে খাটের তলা থেকে একটা নকল চামড়ার সুটকেশ বের করল। আমি ওদের দুজনকে বাইরে দাঁড়াতে বলে দরজায় ছিটকিনি তুলে সুটকেশের সস্তা তালায় একটুচাপ দিতেই তালাটা খুলে গেল। দেখলাম কয়েকটা দামী কাপড়জামা আর কিছু টুকিটাকি। সেগুলোর তলায় একটা সাদা খাম পেলাম। খুলে তার ভেতর দেখলাম জেনেৎ ওয়েস্টের দেওয়া ফটোগ্রাফের অনুরূপ একটা হেরম্যানের ছবি। তলায় লেখা, আমার স্ত্রী-জো-অ্যানকে। হয়ত হেরম্যান দুজনকেই ঐ একই ফটোগ্রাফ দিয়েছে।

যাইহোক, লেইলা এবং রিসেপশন ক্লার্কের মধ্যে যে কেউ একজন মিথ্যে বলছে, লেইলা কেন মিথ্যে বলবে?

চিন্তা করে দেখলাম এই ছোট, নোংরা হোটেলে থেকে আমার দরকারী কোন সূত্রের সন্ধান পাবনা। আমাকে এই রহস্যের সূত্রের জন্যে অন্য কোথাও যেতে হবে।

দরজা খুলে বাইরে এসে দেখলাম ওয়ং সিগারেট খাচ্ছে দাঁড়িয়ে আর বৃদ্ধ নেই, হয়ত কাউন্টারে ফিরে গেছে।

আপনার সব কাজ ঠিকমত হয়েছে তো স্যার? ওয়াং-এর প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, হ্যাঁ তবে শুনুন ওয়ং, আমি এখানে থাকবনা। রিপাল উপসাগরের কাছে কোন হোটেল পাওয়া যাবে?

একটু অবাক হয়ে ও বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ রিপালস্ বে হোটেল ওখানে খুব সুন্দর। আপনি বললেই ব্যবস্থা করতে পারি।

যদি পারেন এক্ষুনি আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।

একটা ব্যাপার স্যার। হোটেলটা কিন্তু চলতি পথের বেশ দূরে। কউলুন ঘুরতে গেলে হোটেলটা আপনার পক্ষে খুব একটা সুবিধাজনক হবে না।

–সেজন্য আমি ভাবছি না। আপনি বৃদ্ধকে এখনই আমার বিল রেডি করতে বলুন। আ ঘরটাও চেক করে নি।

আপনি লোকটাকে আর প্রশ্ন করবেন না? ওয়ং প্রশ্ন করল।

-না। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাব।

মিনিট তিরিশ পর আমরা প্যাকার্ড গাড়ীতে চড়ে রিপাসের দিকে রওনা হলাম।

.

২.৫

রিপালস্ উপসাগরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে পাহাড় ঘেরা এলাকা,নীল সমুদ্রের জল আমাকে মুগ্ধ করল। হোটেলটাও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে বেশ মানানসই। এমন সুন্দর জায়গা আমি খুব কম দেখেছি।

ওয়ং আমাকে হোটেলের যে ঘরটির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়। প্যাকার্ড গাড়ীটা রেখে বলে গেছে যে কোন প্রয়োজনে তাকে ডাকলে সে খুশী হবে!

এরপর জিনিষপত্র গুছিয়ে টেলিফোন গাইডে কোথাও হেরম্যান জেফারসনের নাম পেলাম না। রিসেপশনে ক্লার্কও তার নাম শোননি বলে জানিয়ে দিল।

একটা ভাল হোটেলের বয় সমস্ত খবর রাখে–এই প্রবাদ মনে রেখে আমার রুম বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম সে এমন অট্টালিকার খবর জানে কি যার প্রান্ত ধাপে ধাপে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে, যেখানে ছোট একটা ঘাট এবং একটা বোটও আছে।

একটু চিন্তা করে সে বলল, আপনি লিফান-এর বাড়ীর কথা বলছেন? এখন সে বাড়ীতে মিঃ এনরাইট আর তার বোন থাকেন। তারাও আমেরিকান।

–ঐ বাড়ীতে মিঃ হেরম্যান জেফারসন বলে কেউ থাকত বলে তুমি শুনেছো? আমি জিজ্ঞেস করলাম। ও মাথা নেড়ে বলল যে সে জানে না।

বীচ-এগিয়ে পেডালো ভাড়া করে ভাসতে ভাসতে পুরো উপকূল এলাকাটা দেখতে লাগলাম। লিন-ফান-এর বাড়ীটা আলাদাভাবে চিনে নিতে আমার অসুবিধা হল না। সমুদ্রের মধ্যে উঁচু জমি আলাদা হয়ে আছে।

আমি পেডালো চালিয়ে বাড়ীটার দুশো গজের মধ্যে এসে থেমে বাড়ীটা ভাল করে দেখতে লাগলাম। হেরম্যান সত্যিই কি এত পয়সা রোজগার করেছিল যে এত বড় বাড়ী ভাড়া করেছিল? নাকি লেইলাকে অ্যান মিথ্যে কথা বলেছিল?

হঠাৎ আমি সচকিত হলাম। বাড়ীটার সবচেয়ে উঁচু ঘরটায় দুটো বিন্দু। আমি মিনিট দশেক ধরে পেডালো চালিয়ে বুঝলাম, খুব শক্তিশালী লেন্স দিয়ে দুটো চোখ আমাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। সূর্যের আলোয় লেন্স দুটো আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। পেডালো ঘুরিয়ে নিলাম বীচ-এর দিকে।

এক ঝলক তাকিয়ে দেখে বুঝলাম বিন্দু দুটো এখনো আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। আমি মুখে টুরিস্ট টুরিস্ট ভাব ফুটিয়ে ভাবলাম এত চিন্তা করার কি আছে? সুন্দর বাড়ী তাই দেখছিলাম। যুক্তিটা নিজেই মানতে পারলাম না। অতএব হোটেলে ফিরে এলাম।

.

২.৬

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ বীচ-এ এলাম। কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে বালির ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। হেরম্যান, ওয়েস্ট, বৃদ্ধ জেফারসন, অ্যান, লেইলাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম তখনকার মতো। একটু ঝিমুনি ভাব এসেছিল, খুব কাছে পদশব্দ শুনে চোখ খুললাম। দেখলাম লম্বা, স্লিম, রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রং, বিকিনী পরা একটা মেয়ে আমাকে পেরিয়ে গেল। বীচে শুয়ে থাকা সকলে আগ্রহের সঙ্গে ওকে দেখছে।

তপ্ত বালির ওপর দিয়ে মেয়েটা সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। ওর ফিগারটা চুম্বকের মত আমাকে আকর্ষণ করছিল। লক্ষ্য করলাম রোদটুপীটাকে অবহেলাভরে বালিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জলে নেমে, দক্ষতার সঙ্গে কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে বিশাল একটা পাথরের চাইয়ের ওপর গিয়ে উঠল। ওকে নির্জন এলাকার রাণী বলে মনে হতে লাগল। ওর সঙ্গ পাওয়ার জন্যে আমার মন অস্থির হয়ে ওঠায় আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। ঘোট ঘোট আকর্ষণীয় স্টোকে এগোতে লাগলাম। পাথরের কাছে এসে ওকে বললাম, যদি আমি এই সুন্দর নির্জনতাকে ভেঙে থাকি তো বলুন সাঁতরে অন্যদিকে চলে যাই।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। আমিও ওকে বেশ কাছ থেকে দেখে বুঝলাম বহু পুরুষের সঙ্গলাভের অভিজ্ঞতা এই মেয়ের আছে। চোখের ভাষা বলে দিচ্ছে–এই ধরণের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গ লাভের জন্যে খুবই আগ্রহী।

ও কামোত্তেজক গলায় হেসে বলল, আমি বরং আশায় আছি কেউ এসে আমাকে সঙ্গ দেবে। আপনি কে? মনে হচ্ছে আজই উড়ে এসেছেন? তাই নয় কি?

আমার নাম নেলসন রায়ান। বিখ্যাত ইংরেজ অ্যাডমিরালের নামানুসারে আমার বাবা আমার নাম রেখেছেন। তিনি অ্যাডমিরাল নেলসনের অন্ধ ভক্ত ছিলেন।

মেয়েটা পাথরের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, আমি স্টেলা এনরাইট। এখানেই থাকি। নতুন নতুন মুখ আমার ভাল লাগে। আপনি কি এখানে অনেকদিন থাকবেন?

এই মুহূর্তে আমি ভাবতে লাগলাম এটা আমার সৌভাগ্য নাকি বিস্ময় আমার সামনে অপেক্ষা করছে! যে লোকটা লিমফোনের বাড়ী ভাড়া নিয়েছে তার বোন আমার সামনে?

বললাম, সপ্তাহখানেক থাকব।

আমি ওয়াটার প্রুফ পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে ওকে দিলাম। দুজনে সিগারেট ধরালাম। বললাম, এই সুন্দর জায়গায় বাস করা তো ভাগ্যের ব্যাপার!

ধন্যবাদ। এখন আবহাওয়া খুবই সুন্দর, কিন্তু গ্রীষ্মকালটা খারাপ। সিগারেটের ধোয়া উড়িয়ে বলল, আমার দাদা হংকং-এর ওপর একটা বই লিখছে। আমি দাদার দেখাশোনা করি। মাথাটা একটু তুলে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি হোটেলে আছেন?

-হ্যাঁ। আপনাদের এখানে বাড়ী আছে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

আমরা একটা বাড়ী ভাড়া নিয়েছি, যেটা একটা চীনা গ্যাম্বলারের।

লিনফান?

ও বেশ অবাক হয়ে বলল, ঠিক ধরেছেন, আপনি এত সব জানলেন কি করে?

-আমি শুনেছিলাম। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, আমি ভেবেছিলাম ওটা হেরম্যান জেফারসন ভাড়া নিয়েছে।

ও ভুরু তুলে আমার দিকে তাকাল।

বোঝা গেল কথাটা সত্যিই ওকে অবাক করেছে, হেরম্যান জেফারসন? আপনি তাকে জানলেন কিভাবে?

আমি যে শহরে থাকি, ও সেই শহরের ছেলে।

–ও। হেরম্যান তো একটা মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে।

–হ্যাঁ। সেরকমই শুনেছিলাম। আপনি তাকে চিনতেন?

-হ্যারি, আমার দাদা ওকে চিনত। আমি ওকে দু-একবার দেখেছি। তাহলে আপনি ওকে, চিনতেন? হ্যারি শুনলে খুব খুশী হবে। লোকটার মৃত্যুটা খুবই দুঃখজনক, ওর চীনা স্ত্রীর পক্ষেও এটা দুঃখের।

আপনি ওর স্ত্রীকে চেনেন?

ঠিক চিনি বলতে পারিনা। তবে দেখেছি।

টুসকি মেরে সিগারেটের ছাই ফেলে বলল, কিছু চীনা মেয়ে সত্যিই আকর্ষণীয়। কিন্তু হেরম্যান যে খুব নীচে নেমে গিয়েছিল তা ঐ মেয়েটার জন্যেই। ঐ মেয়েগুলো ওরকমই হয়। কথাগুলো তেতো, কিন্তু মিষ্টি মোড়কে জড়ানো। এটা আমার কান এড়াল না।

ও বলতে থাকল, হেরম্যানের মৃতদেহ নিয়ে ও আমেরিকা চলে গেছে। আমার তো মনে হয় ওখানেই থেকে যাবে, আর আসবে না কারণ হেরম্যানের বাবা শুনেছি লক্ষপতি। সুতরাং মেয়েটার ভার নেবেন।

আমি আর একটু হলেই বলে দিতাম অ্যান মরে গেছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে জিজ্ঞেস করলাম, আমি শুনেছিলাম যে হেরম্যান নাকি অনেক টাকার মালিক হয়ে যায় হঠাৎ। তারপর ওর স্ত্রীকে আপনারা এখন যে বাড়ীটায় ভাড়া আছেন সেটা ছেড়ে দিয়ে চলে যায়?

স্টেলা মাথা তুলে কুটি করল।

বাঃ কে আপনাকে এসব অদ্ভুত গল্প বলেছে?

–হয়তো কেউ একজন বলেছিল। তারপর হালকা গলায় বললাম, কেন ঘটনাটা কি সত্যি নয়?

না একেবারেই না। আরাম করে শরীর বিছিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, সত্যি কথা বলতে কি হেরম্যান খুব একটা ভাল লোক ছিল না। আমি ওকে পছন্দ করতাম। জংলী স্বভাবের ছিল। কিন্তু হ্যারিকে ও আনন্দ দিত। ওর কোন কালেই পয়সাকড়ি ছিল না। ও নাকি ওর চীনা স্ত্রীর পয়সায় খেত। তাহলে ও এ বাড়ী কি করে ভাড়া নেবে? কে বলেছে আপনাকে এই কথা?

একটা দ্রুতগামী মোটর বোটের ইঞ্জিনের শব্দে আমরা সচকিত হয়ে দেখলাম, একটা স্পীডবোট সাদা ফেনা ছড়িয়ে আমাদের দিকেই আসছে।

-ঐ যে হ্যারি আসছে। স্টেলা উঠে দাঁড়িয়ে বোটটার দিকে হাত নাড়তে লাগল।

বোটটার গতি কমে ইঞ্জিন বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম। পাথরের গায়ে এসে বোটটা থামল। একজন হাফপ্যান্ট পরা, রোদে পোড়া, সবুজ-সাদা ডোরাকাটা শার্ট পরা লোক স্টেলার দিকে চেয়ে হাসল। মুখ দেখে মনে হয় ইনি বেশ স্বচ্ছল আর চামড়ার নীচে সরু নীল শিরা দেখে বোঝা যায় ইনি মদ্যপান একটু বেশীই করে থাকেন। আমার দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে স্টেলাকে বলল, ভাবলাম লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে তোমাকে তুলে নিয়ে যাব। তা তোমার এই বয়ফ্রেন্ডটি কে?

–ইনি নেলসন রায়ান। জেফারসনের সঙ্গে এর পরিচয় ছিল।

তারপর স্টেলা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার দাদা, হ্যারি। আমরা দুজন-দুজনকে অভিবাদন করলাম।

–আপনি হেরম্যানকে জানতেন? তাহলে খুব ভাল হল। আপনি এখানে কদিন আছেন?

–দিন সাতেক। আমার দুর্ভাগ্য আমি এখানে বেশীদিন থাকতে পারছি না।

–শুনুন। আজ যদি আপনার কোন এনগেজমেন্ট না থাকে তাহলে আমাদের সঙ্গে আপনি ডিনার করবেন? আমি এখানেই আপনাকে বোটে তুলে নেব। এটাই আমাদের ওখানে যাবার একমাত্র পথ। কি আসবেন তো?

নিশ্চয়ই। এ তো খুব ভাল কথা। তবে কি, আপনাকে আমাকে নিতে এসে আর কষ্ট করতে হবেনা। আমি নিজেই চলে যাবো।

–আরে তাতে কি? ঠিক আটটার সময় বীচে আসবেন, আমি আপনাকে নিয়ে যাব। তারপর ডিনার খেয়ে আমরা এই বোটে একটু বেড়াব। দেখবেন কী সুন্দর লাগে। স্টেলার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি এখন যাবে?

–আমাকে আগে বীচ-এ নিয়ে চল, আমি টুপিটা ফেলে এসেছি।

স্টেলা বোটে চড়ে বসল। আমি ওর রোদে পোড়া সুঠাম পিঠ থেকে চোখ সরাতে পারলামনা। ও হঠাৎ পেছন দিকে তাকাতে আমি ধরা পড়ে বিব্রত বোধ করলাম। ও হাসল, যেন আমার মনের ভাষা বুঝতে পেরেছে। হাত নেড়ে বলল, চলি আজ রাত্রে দেখা হচ্ছে, হ্যারি আমাকে দেখে মাথা ঝাঁকাল। আমি হাসলাম। বোটটা এগোলো।

আমি সিগারেট ধরিয়ে জলে পাদুটো ডুবিয়ে মনে একটা উত্তেজনা অনুভবকরলাম। আধঘণ্টা সূর্যের উত্তাপে শরীরটা শুকিয়ে এখন বেশ খিদে অনুভব করলাম। সাঁতার কেটে বীচে ফিরে এলাম।

ঠিক আটটায় নীচে পৌঁছলাম। কয়েক মিনিট বাদে স্পীড বোটটা দেখা গেল, একজন স্বাস্থ্যবান চীনা ড্রাইভার আমাকে হাত ধরে বোটে উঠতে সাহায্য করল আর বলল, মিঃ এনরাইট আসতে পারেন নি, সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন।

কয়েক মিনিটেই লিমফানের বাড়ী পৌঁছে গেলাম।

বোট থেকে নেমে সিঁড়ি পেরিয়ে উঁচু জমিতে এলাম। জায়গাটা সুন্দরভাবে সাজান। স্টেলা ইভনিং ড্রেস পরেছে। ফ্রকটা লোকাট। একটা বাঁশের আরাম কেদারায় বসে

হইস্কি খাচ্ছে ও মুখে সিগারেট। পাশে একজন চীনা পরিচারক ওর হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। হ্যারিকে কোথাও দেখতে পেলাম না।

–আপনি এসে গেছেন। হাতের হুইস্কির গেলাসটা নামিয়ে আমাকে স্বাগত জানালো। কি খাবেন বলুন?

আমি স্কচে সোডার কথা বলাতে সঙ্গে সঙ্গে পানীয় এসে গেল।

–হ্যারি এখনই এসে পড়বে। আপনি ঐ চেয়ারটায় বসুন তাহলে আপনাকে ভালভাবে দেখতে পাবো।

আমি বসে বিশ্রামকক্ষটি ভালভাবে দেখতে লাগলাম। ঘরটা চীনা স্টাইলে সাজানো, দামী দামী আসবাব রয়েছে। দেওয়ালে লাল সিল্কের পর্দা। মাঝখানে বড় কালো রঙের ডাইনিং টেবিল। ডিনারের খাবার সব প্রস্তুত।

–আপনাদের এই জায়গাটা আমার খুব ভাল লেগেছে। আমি হেসে বললাম।

-হ্যাঁ। জায়গাটা সত্যিই ভাল। ভাগ্য ভাল ছিল বলে এ জায়গাটা পেয়ে গেছি, আগে কউলুনে একটা বাড়িতে থাকতাম। মাত্র কয়েক সপ্তাহ এখানে এসেছি। তবে ওটার তুলনায় এটা অনেক ভাল।

–আপনারা আসার আগে এখানে কে ছিল?

মনে হয় না কেউ ছিল। এর মালিক ম্যাকাউতে থাকে। উনি তো এই সেদিন ঠিক করলেন যে বাড়িটা ভাড়া দেবেন।

ঠিক এই সময়ে এনরাইট এল। আমরা করমর্দন করে মুখোমুখি বসলাম।

দু-চারটে সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর হ্যারি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখানে ব্যবসায়ের ব্যাপারে এসেছেন?

না। আমি ছুটি কাটাতে এসেছি। সপ্তাহ খানেক ছুটি পেয়ে আর লোভ সামলাতে পারলাম না।

যাক ভাল করেছেন। তারপর খুব অন্তরঙ্গ গলায় বলল, স্টেলা বলছিল, আপনি নাকি প্যাসাডোনা সিটি থেকে এসেছে। তাহলে আপনি হয়তো হেরম্যান জেফারসনকে চিনে থাকবেন?

–হ্যাঁ। আমি ওর চেয়ে ওর বাবাকে ভালভাবে জানি। ভদ্রলোক আমি এখানে আসছি শুনে আমাকে হেরম্যানের ব্যাপারে একটু খোঁজ-খবর নিতে বলেছেন।

হ্যারি আমার দিকে বেশ আগ্রহভরে তাকিয়ে বলল, তাই নাকি? কী ধরনের খোঁজ খবর?

–দেখুন ও প্রায় পাঁচবছর এখানে আছে। এরমধ্যে ওর বাবাকে চিঠিপত্র লিখত না বললেই চলে। শুধু ও চীনা মেয়েকে বিয়ে করছে জানিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিল। তাতে

ওর বাবা খুব আঘাত পেয়েছিলেন। আমি এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলাম। হ্যারি স্টেলার দিকে তাকাল আর মাথা নাড়াল, খুব স্বাভাবিক।

–দেখুন মিঃ এনরাইট আমার মনে হয়, ভদ্রলোক ওর জীবিতকালে ওর জন্যে কিছু করতে পারেননি বলে খুব কষ্ট পেয়েছেন। ও এখানে কীভাবে রোজগার করত, সে ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন?

–আমার মনে হয়না ও কিছু করত। ছেলেটা বেশ রহস্যময় ছিল। আমি ওকে পছন্দ করলেও অনেকেই ওকে ভালমনে নিতে পারত না। আমার বোন স্টেলা তো ওকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না। স্টেলা একটু অধৈর্য হয়ে বলল, বেশী বাড়িয়ে বোলনা। আমি ওকে দেখতে পারতাম না শুধু এই কারণেই, কেননা ও ভাবত সব মেয়েই বুঝি ওর প্রেমে পড়ে গেছে। এই ধরণের লোকদের আমি পছন্দ করিনা। এনরাইট বেশ জোরে হেসে উঠল।

–ঠিক আছে তুমি ওর প্রেমে পড়নি। মনে হয় ও টক আঙুর ছিল। মিঃ এনরাইট বলল।

–তাহলে তোমার কোন নীতির বালাই নেই, যে কেউ তোমাকে আনন্দ দিলেই তুমি তাকে পছন্দ করে নাও। স্টেলা বলল।

একজন পরিচারক এসে বলল ডিনার প্রস্তুত। আমাদের কথাবার্তায় বাধা পড়ল। আমরা ডিনাররুমে ঢুকলাম।

খুব ভাল চীনা খাবার পরিবেশিত হলো। আমার খেতে খুব ভাল লাগছিল। স্টেলাকে একটু অন্যমনস্ক লাগছিল।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ মুহূর্তে, হঠাৎ স্টেলা প্রশ্ন করল, মিঃ রায়ান, আপনাকে কে বলেছিল হেরম্যান এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিল?

ওর কথা শুনে মিঃ এনরাইট খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হেরম্যান এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল? ঈশ্বরের দিব্যি। আপনাকে কেউ বলেছিল এই কথা?

আমি বললাম, একটা চীনা মেয়ে। সেলেশিয়াল এম্পায়ার হোটেল, যেখানে হেরম্যান ভাড়া থাকত, সেই হোটেলে মেয়েটার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। ওই বলেছিল।

আশ্চর্য। স্টেলা ভুরু কুঁচকে বলল, এরকম বাজে কথা বলার অর্থ কি? আমি কাধ ঝাঁকালাম। বললাম, জানি না, হয়ত ও মিথ্যে বলেছিল।

হঠাৎ আমার মনে হল, মিনিট খানেক হল কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বললাম, আমি ওকে হেরম্যানের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমি এও বলেছিলাম সে কিছু বললে ওকে টাকা দেব। সেই লোভে হয়তো এইসব মিথ্যা বলেছে।

–আমার ঠিক উল্টোদিকের বিরাট আয়না দিয়ে আমার পুরো শরীরটা দেখা যাচ্ছে আর আয়নার ভেতর দিয়ে দেখলাম একটা শক্তসমর্থ চেহারার চীনা ইউরোপীয় স্যুট পরা আমাকে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে। আমি আয়না দিয়ে তাকাতে ওর সঙ্গে

চোখাচোখি হয়ে গেল। হতেই লোকটা অন্ধকারে মিশে গেল। বিপদের গন্ধ পাওয়া সত্ত্বেও আমার চোখে-মুখে সেটা বুঝতে দিলাম না। ও যে আমায় লক্ষ্য করছে আমি দেখেছি সেটা ঝেড়ে ফেলার জন্যে শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে বললাম, যাকগে বাদ দিন ও নিশ্চয়ই আমাকে ধাপ্পা দিয়েছিল।

চীনারা বিশেষ করে চীনা মেয়েরা ভীষণ মিথ্যে কথা বলে। পৃথিবীতে এরা এক নম্বরের মিথ্যেবাদী। আমার দিকে গভীর ভাবে চেয়ে এনরাইট বলল।

আয়নার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, তাই নাকি? আচ্ছা।

স্টেলা আমার কথায় বাধা দিয়ে বলল, চলুন, আমরা একটু টেরেসে গিয়ে বসি। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে স্টেলা বলল, আপনি কি একটু ব্রান্ডি নেবেন?

আমি বললাম, না।

ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের সেই ছেড়ে যাওয়া জায়গায় আবার এসে বসলাম। মাথার ওপরের চাঁদের আলো সমুদ্রের ওপর পড়ে একটা মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

আমাকে কয়েকটা টেলিফোন করতে হবে। দয়া করে অনুমতি দেন তো কাজটা সেরে আসতে পারি। আপনারা একটু বসুন। তারপর আমরা বোটে করে বেড়াব। আপনার আপত্তি নেই তো? এনরাইট আমার দিকে চেয়ে বলল।

আমি স্টেলার দিকে চেয়ে বললাম, আপনি বেড়াতে যাবেন তো? তাহলে আমার আর আপত্তি কোথায়?

-হ্যাঁ, আমি যাবো। কেমন একটা হতাশ গলায় স্টেলা বলল, হ্যারি তো ওর বোট ছাড়া কিছুই জানে না।

আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে হ্যারি চলে গেছে। স্টেলা আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। আমি ওর হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের কিনারায় এসে দাঁড়ালাম।

–একদিক থেকে কিন্তু মেয়েটার ভাগ্য ভাল বলতে হবে। সতৃষ্ণ কণ্ঠে স্টেলা বলল, আমি ওর দিকে তাকালাম। হেরম্যানের বাবা তো খুব ধনী, আমার তো মনে হয় ওর বাবা পুত্রবধূকে দেখবে।

কিন্তু ওর স্বামী মারা গেছে, আমি বললাম।

এখনো ঠিক করে উঠতে পারছি না, জো-অ্যান মারা গেছে বলব কিনা।

একটু অসহিষ্ণুভাবে স্টেলা বলল, অতে তো বরং ভালই হয়েছে। এখন ও মুক্ত, স্বাধীন। শশুরের কাছ থেকে ইচ্ছেমত টাকাপয়সা পাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা ও নিউইয়র্ক যেতে পেরেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলল, আমার নিউইয়র্ক যেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।

–আপনারা নিউইয়র্ক থেকে আসছেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হুমম। একবছর হলো, দেশে ফেরার জন্যে আমি ভীষণ কাতর।

–আপনি কেন চলে যাচ্ছেন না? আপনি তো ইচ্ছে করলেই যেতে পারেন। এখানে যে থাকতেই হবে এমন তো কোন কথা নেই। আমি ওর মনের কথা জানবার জন্যে বললাম।

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে বলল,না তা নেই ঠিকই। তবে চিরকাল দাদার সঙ্গে থেকে থেকে একসঙ্গে থাকার অভ্যাস হয়ে গেছে। কাজেই...তারপরেই কথা পাল্টে দূরে পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, চাঁদনী রাতে কি সুন্দর দৃশ্য না?

আমি ভাবলাম ও বারবার এমন প্রসঙ্গ পাল্টাচ্ছে কেন? আমি অবশ্য এনরাইট আসার আগে পর্যন্ত ওর তালে তাল মিলিয়ে প্রকৃতির প্রশংসা করে গেলাম।

হ্যারি এসে গেল। বলল, চলুন যাওয়া যাক। এবারডীন কেমন লাগবে? ওটা এখানকার জেলেদের গ্রাম। খুব সুন্দর জায়গা।

চলুন। আমরা এসে বোটে উঠলাম। এনরাইট চালাতে লাগল। আমি আর স্টেলা পিছনের আসনে বসলাম। বোটটা গর্জন করে সমুদ্রে ভাসল।

ইঞ্জিনের বিকট শব্দের জন্যে আমরা কথা বলতে পারছিলাম না। স্টেলা বিষণ্ণ মুখ করে চুপচাপ সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল। মনে হচ্ছে, কোন দুঃখজনক ঘটনা মনে মনে চিন্তা করছে। আমি এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনা ও তথ্যগুলো মনে মনে ভাবতে লাগলাম।

এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না লেইলা মিথ্যা বলেছে বলে। নাকি এনরাইটরাই আমার কাছে কিছু গোপন করতে মিথ্যে বলছে। নয়তো এরা সঠিক তথ্য জানেনা।

আমরা পৌঁছে গেলাম এবারডীন গ্রামে। ঘাটের মুখটা ছোট বড় নৌকোয় ভর্তি। ঘাটে নামার কোন জায়গাই নেই। এনরাইট ঘাট থেকে বেশ দূরে বোটটা নোঙর করল। এরপর আমরা স্যাম্পান করে পার হয়ে এলাম। স্যাম্পান–তলাটা চ্যাপ্টা–একরকমের ছোট নৌকো। এরপর আমরা খানিকক্ষণ ঐ জেলেদের গ্রামটায় ঘুরলাম। চীনারা তাদের ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে এসেছে। চাঁদের আলোয় গ্রামটার সৌন্দর্য যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল।

স্টেলা জানাল ও ফিরতে চায়। কারণ ওক্লাস্তবোধ করছে। আবার আমরা স্যাম্পান চেপে ফিরে এলাম। আসতে আসতে স্টেলা বলল, আপনি এখানকার দ্বীপগুলো যদি না দেখে থাকেন তবে একটা ফেরি নৌকো নিয়ে নেবেন।

না এখনো দেখিনি।

কাল যদি আপনার কোন কাজ না থাকে তো বলুন। আমি কাল সিলভার মাইনে একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাব। ওখানে একটা জলপ্রপাত আছে, ওটা দেখে আসতে পারবেন, খুব ভাল লাগবে। তারপর আমরা একসঙ্গে ফিরে আসব।

-খুব ভাল কথা, আমি রাজী।

–আমার বোন বড় দয়ালু। হ্যারি বলল, আমরা যখন প্রথম এখানে আসি তখন এক মহিলা আমাদের কাছে কাজ করত। এখন সে অবসর নিয়ে সিলভার-মাইনে থাকে। স্টেলা মাঝে-মাঝে ওর সঙ্গে দেখা করে জিনিষপত্র দিয়ে আসে।

আবার আমরা বোটে চড়লাম। বোট ছাড়তেই কথা বন্ধ হয়ে গেল। মিনিট কুড়ি পর স্টেলাদের বাড়ি পৌঁছলাম। স্টেলা ঘাটে নেমে গেল। হ্যারি আমাকে বীচে পৌঁছে দেবে বলল।

শুভরাত্রি। একটু হেসে স্টেলা বলল, ফেরি বোট দুটোর সময় ছাড়ে, আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।

এই সুন্দর সন্ধ্যায় ওদের সঙ্গ পেয়ে আমি খুশী হয়ে স্টেলাকে ধন্যবাদ জানালাম। দুজনে দুজনের দিকে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানালাম। ইঞ্জিন আবার গর্জে উঠল।

বীচে নামার মুখে হ্যারি জিজ্ঞেস করল, আপনি কবে ফিরছেন?

–এই হপ্তাখানেক পরে। ঠিক বলতে পারছি না।,

-ঠিক আছে। আশা করি আবার আসবেন। আপনার সঙ্গ খুব ভাল লাগল আমার, আমরা উভয়ে করমর্দন করলাম।

হ্যারি বোট চালিয়ে চলে গেল। আমি ওকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

আস্তে আস্তে হেঁটে হোটেলে ফিরতে লাগলাম। আমি কিছুতেই সেই আয়নার ভেতর দিয়ে তাকানো চীনা লোকটাকে ভুলতে পারছি না। ওর সেই চাউনি এখনও আমার চোখে ভাসছে।

আমার সহজাত অনুভূতি বলল–সাবধান। বিপদ আসছে।

.

২.৭

পরদিন সকালে আমি আমেরিকান কনস্যুল-এর থার্ড সেক্রেটারির অফিসে চলে এলাম।

ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমাকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হল। অনেক ঝামেলা, অন্যান্য কর্মীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার ওর ঘরে ঢোকার সৌভাগ্য হল।

ভদ্রলোক বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তেল চর্চকে চেহারা। অফিস ঘরটা কূটনৈতিক গুরুগম্ভীর আলোচনা করার জন্যে উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সেইভাবে সাজানো হয়েছে। আমার ভিজিটিং কার্ডটা ছুঁয়ে, চোখ কুঁচকে একবার তাকাল। যেন ওটা ছুঁলে দুরারোগ্য কোন ব্যাধি থেকে আর নিস্তার নেই।

নিজেই উচ্চারণ করল নেলসন রায়ান..প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। তারপর আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, বলুন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?

আমি মিঃ জে-উইলবার.জেফারসনের হয়ে কাজ করছি। দিন সতের আগে ওর ছেলে। হেরম্যান জেফারসন এখানে একটা মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। সে ব্যাপারে আমি কিছু অনুসন্ধান করতে এসেছি।

–হুম, তা আমাকে কি করতে হবে? একটা সিগারেট ধরিয়ে ভদ্রলোক বললেন।

–ও হংকং-এর বাসিন্দা ছিল। সুতরাং আমার মনে হয়, ওর নাম নিশ্চয়ই এখানে রেজিষ্ট্রি করা ছিল। আমি বললাম।

–হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

-আপনি ওর শেষ ঠিকানাটা দিতে পারেন? ভদ্রলোকের চোখের চাউনি স্বাভাবিক হল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা আমি একটা কথা বলছি, সেটার কি কোন প্রয়োজন আছে? ওটা মরা ফাইল, ভল্টে চলে গেছে। ওখান থেকে বের করা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

-বাঃ। আমি কি মিঃ জেফারসনকে গিয়ে একথা বলব যে সময় লাগবে বলে এই সামান্য সাহায্য আমেরিকান কনস্যুল-এর সেক্রেটারি একজন আমেরিকানের জন্যে করতে পারেনি।

মনে হল, জেফারসনের নামটা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে থার্ড সেক্রেটারি নড়ে চড়ে বসল। উঁচু মহলে জেফারসনের দহরম-মহরম সম্বন্ধে সজাগ হল। তাড়াতাড়ি টেলিফোন

তুলে, মিস্ ড্যাভেনপোর্ট? শুনুন, হেরম্যান জেফারসনের ফাইলটা...হ্যাঁ...হ্যাঁ, হেরম্যান জেফারসন।

–রিসিভার রেখে আমার থেকে কোটিপতি মিঃ জে. উইলবার জেফারসনের খোঁজ নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন তিনি?

–ভালই আছেন। পা বাড়িয়েই আছে। যখন দরকার পড়বে পাছায় লাথি মারবেন। ভদ্রলোকের পা দুটো বেশ লম্বা, জুতোজাড়াও বেশ ভারী।

থার্ড সেক্রেটারির নাম হ্যারিস উইলকক্স। আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগল।

–ভালই বলেছেন। উনি কিন্তু অনেকদিন বেঁচে আছেন। হয়তো দেখব আমরা যখন কবরে যাবো তখনও উনি বেঁচে আছেন।

দরজা খুলে মিস্ ড্যাভেনপোর্ট ঢুকল। পাতলা ছিমছাম চেহারা, বয়স বছর পঁচিশেক। একটা পাতলা, হয়তো কিছুই নেই, ফাইল টেবিলের ওপর রেখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, তারপর মেয়েটা ওর নিতম্ব দুলিয়ে বেরিয়ে গেল। আমরা দুজনেই ওর যাওয়া লক্ষ্য করলাম।

ও বেরিয়ে যাবার পর উইলকক্স খানিকটা ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, দেখুন প্রায় সব কাগজপত্র ওর ডেডবডির সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন এখানে কি পাওয়া যায় দেখি। ফাইল খুলে বলল, হ্যাঁ এই নিন, ওর শেষ ঠিকানা ছিল সেলেশিয়াল এম্পায়ার

হোটেল। হংকং এ এসেছিল তেসরা সেম্বের উনিশশো ছাপান্ন সালে এবং সেই থেকেই ঐ হোটলেই থাকত। গত বছর একটা চীনা মেয়েকে বিয়ে করেছিল। ও কাগজটা দেখার সময় জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা ও এখানে জীবিকা নির্বাহ করত কিভাবে?

–এখানে তো লেখা আছে যে ও এদেশে এসেছিল একজন রপ্তানীকারক হিসেবে। তবে আমার মনে হয় না ও কিছু করত বলে, আর ও সুস্থ জীবন-যাপন করত না।

-আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন যে জেফারসন রিশা উপসাগর তীরে একটা বিশাল অট্টালিকা ভাড়া করেছিল।

উইলকক্স আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, তাই নাকি? তাহলে তো ও ঠিকানা পরিবর্তন করে সেটা রেজিস্ট্রি করত। না, না। আপনি কি সঠিক জানেন? কোন অট্টালিকা?

–লিমফান-এর বাড়িটা।

-ওঃ। না,না মিঃ ব্রায়ান। ঐ বাড়িটার ভাড়া ব্রিটিশ মুদ্রায় এখন মাসে অন্ততঃ চারশো পাউন্ড। অত পয়সা ওর ছিলনা।

-এখন ঐ বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন মিঃ হ্যারি এনরাইট। ওর বোনকে নিয়ে থাকেন। আমি বললাম। ও মাথা নাড়ল আর ওর চোখে মুখে বেশ উৎফুল্ল ভাব দেখলাম।

–হ্যাঁ আমি জানি। মিঃ এনরাইট তো এক ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছ থেকে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন। তার নামটা আমার মনে নেই। মিঃ এনরাইট একজন সজ্জন ব্যক্তি। ওর বোনও আমার মনে হয় হংকং-এর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়া মহিলা!

আমার মনে হয় এনরাইট ভাড়া নেবার আগে বাড়িটা খালি ছিল। আমি বললাম।

না না, ওর আগে এক ইংরেজ ভদ্রলোক ছিলেন, আমি শুনেছি।

–জেফারসনের সঙ্গে চীনা মেয়েটার কি সত্যিই বিয়ে হয়েছিল?

নিশ্চয়ই! এখানেই ওদের বিয়ে হয়েছিল, আপনি চাইলে আমি ওদের ম্যারেজ সার্টিফিকেটের কপি দেখাতে পারি।

–খুব ভাল কথা। ওটা আমি দেখতে চাই।

ও আবার টেলিফোনকরে মিস্ড্যাভেনপোর্ট-কে সার্টিফিকেটটা আনতে বললেন। আমরা ওর আসার-জন্য অপেক্ষা করছি। মিঃ উইলকক্স বলল, মেয়েটাকে আমার স্পষ্ট মনে আছে। ছোট্ট, সুন্দর, কফিন পাঠাবার জন্য সব কাগজপত্র তো আমিই করে দিয়েছিলাম। এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা। ওকে সত্যিই দুঃখিত দেখাল। আবার বলল, মেয়েটার জন্য আমার কষ্ট হয়।

মিস্ ড্যাভেনপোর্ট খুব আস্তে ঘরে ঢুকে সার্টিফিকেটটা দিয়ে তার নিজস্ব মরাল-গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমরা দুজনেই ওর যাওয়ার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম।

তারপর দুজনের চোখাচোখি হতেই উইলকক্স তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে ডেস্কের ওপর দিয়ে আমার দিকে সার্টিফিকেটটা বাড়িয়ে দিল।

সার্টিফিকেট পরীক্ষা করে দেখলাম একবছর আগে জেফারসনের সঙ্গে জো-অ্যান-এর বিয়ে হয়। বিয়েতে সাক্ষী ছিলেন ফ্রাংক বেলিং এবং মু-হাই-তন।

–এই ফ্রাংক বেলিং ভদ্রলোক কে? আমি সার্টিফিকেটটা দেখিয়ে উইলকক্সকে প্রশ্ন করলাম।

ও মাথা নেড়ে বলল, জানিনা। হয়তো জেফারসনের কোন বন্ধু হবে। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ইংরেজ। ওদের রেকর্ড আমাদের এখানে থাকে না।

–আর এই মেয়েটা? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

–জো-অ্যান-এর বান্ধবী হয়তো।

কলমের পেছন দিয়ে ওর পোর্সিলিন-এ বাঁধানো দাঁত ভেতরে ঠেলে দিয়ে একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর ঘড়ি দেখল।

ওর কাছ থেকে আর কিছু জানার নেই–এই চিন্তা করে উঠে দাঁড়ালাম।

ধন্যবাদ। আমি আর আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করব না। ও হেসে জানাল যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে ও খুব খুশী হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হল, আরো খুশী হচ্ছে আমি চলে যাচ্ছি তাই।

দরজার সামনে এসে প্রশ্ন করলাম, আপনার সঙ্গে হেরম্যান জেফারসনের কখনও আলাপ হয়নি?

না। ওর বেশী মেলামেশা ছিল চীনাদের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে ওর কোন মেলামেশা ছিল না।

কনস্যুলেট ভবন থেকে প্যাকার্ড গাড়ির দিকে আসতে আসতে দেখলাম, একটু দূরে উর্দিপরা দুটো পুলিশ একটা ভিখিরী মেয়ে আর একটা রোগা বাচ্চাকে রাস্তার ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই দ্বীপে প্রতি বছর লাখ খানেক রিফিউজি আসছে, তাই এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে এ দৃশ্য কোন দাগ কাটছে না। কিন্তু আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

গাড়িতে গিয়ে বসলাম। এতক্ষণ পর্যন্ত নতুন কি সূত্র পেলাম মনে মনে ভাবতে লাগলাম। তেমন কিছুই নয় তবে আমাকে চীনা মেয়ে মুহাই-তন আর ফ্রাংক বেলিংকে খুঁজে বের করতে হবে আর কথা বলতে হবে।

গাড়ি নিয়ে সেন্ট্রাল পুলিশ স্টেশনে এসে চীফ ইন্সপেক্টর মিঃ ম্যাকার্থীর সঙ্গে কথা বলতে চাওয়াতে আমাকে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হল। তারপর ঢুকতে পেলাম ওর ঘরে। ম্যাকার্থী ওর পাইপ পরিষ্কার করছিল। আমি ঘরে ঢোকাতে ও আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। তারপর পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলল, বলুন এই সকালে আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?

–আমি ফ্রাংক বেলিং নামে একজনকে খুঁজছি। ওকে আমি কিভাবে পাবো বলতে পারেন?

ম্যাকার্থী পাইপ জ্বেলে আমার দিকে একমুখ ধোয়া ছেড়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। চোখদুটো সজাগ।

–ফ্রাংক রেলিং? এই ভদ্রলোকের ব্যাপারে আপনি আগ্রহী কেন?

দরকার আছে। হেরম্যান জেফারসনের বিয়েতে ও সাক্ষী ছিল, আপনি ওকে চেনেন?

হু, চিনি। ও তাহলে হেরম্যানের বিয়েতে সাক্ষী ছিল।

–হুম...। আপনি জানেন ও কোথায় আছে?

–আমি আপনাকে সেটাই জিজ্ঞেস করছিলাম, মনে পড়েছে?

ও একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, আচ্ছা, আচ্ছা। বেলিং-কে ধরার জন্য আমরা খুবই উগ্রীব হয়ে রয়েছি। ও একটা মাদকদ্রব্য চোরাচালান সংস্থার সভ্য। আমরা যখনই ওকে ধরব বলে ঠিক করেছি, ও হাওয়া হয়ে যায়। এখন ও হয় ম্যাকাউ নয় ক্যান্টন-এ পালিয়েছে।

–তাহলে ঐ জায়গাগুলোতে আপনারা খোঁজ করছেন না কেন?

–ম্যাকাউতে করেছি, কিন্তু ক্যান্টনে খোঁজ নেবার মত সুযোগ সুবিধা আমাদের নেই। আমি চেয়ারে একটু আরামকরে বসলাম।

লোকটা কি ইংরেজ?

–হ্যাঁ,...ও একজন ইংরেজ।

ও যে মাদক দ্রব্য চোরাকারবারীদের সঙ্গে যুক্ত, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। এ মাসের প্রথম তারিখে আমাদের ইনফর্মাররা খবর দিয়েছিল মাল আসছে। বেলিং কয়েক সপ্তাহ আগেও ক্যান্টন থেকে প্রচুর চালান করা হেরোইন এখানে খালাস করার ব্যবস্থা করত। যাই হোক, ইনফরমারের কথানুযায়ী আমরা ওকে ধরার সব ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু ও সেটা আগেই জানতে পেরে ক্যান্টন কিংবা ম্যাকাউতে পালিয়ে যায়।

–এ মাসের প্রথম তারিখ...অর্থাৎ জেফারসনের মৃত্যুর দুদিন আগে...।

হতে পারে। আপনি কি এটাকে বিশেষ কোন ঘটনা বলে মনে করছেন?

আমি শুধু যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় সংবাদ যোগাড় করে চলেছি। আচ্ছা ওর বিয়ের আর একজন মহিলা সাক্ষী মু-হাই-তন, এর সম্বন্ধে কিছু জানেন?

না। ম্যাকার্থী বলল।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, এইসব মাদকদ্রব্য চোরাচালানকারীদের সঙ্গে জেফারসনের কোন যোগাযোগ ছিল বলে আপনার কিছু জানা আছে?

থাকতে পারে। বেলিং-এর সঙ্গে যখন ওর বন্ধুত্ব ছিল তখন এই ব্যাপারে জড়িত থাকলেও থাকতে পারে।

–মেয়েটার ব্যাপারে কোন খোঁজখবর দিতে পারেন না?

–দেখবো। রেকর্ড খুঁজে দেখে জানাব। আপনি রিপালস্ বে হোটেলে উঠে গেছেন?

–হ্যাঁ। বেশ আরাম করে বসেই উত্তরটা দিলাম। কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়ে ম্যাকার্থী বলল, এই আপনারা মানে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটররা আছেন ভাল। সব খরচ তো মক্কেলের তাই না?

মৃদু হেসে আমি ম্যাকার্থীর থেকে বিদায় নিলাম। জানিয়ে দিলাম দরকার পড়লে আবার আসব।

কুইনস রোড সেন্ট্রাল-এর ভীড় ঠেলে গাড়ির কাছে এলাম। গাড়ি চালিয়ে সোজা ওয়াঞ্চাই সমুদ্র এলাকায় সেই বার-এ এলাম। যে বারের মাদাম আমার থেকে একগ্লাস দুধ খেতে চেয়েছিল।

বারটা মোটামুটি খালি। কাউন্টারে দুজন ওয়েটারের মধ্যে একজন আমাকে চিনতে পেরে সোনালী দাঁত বের করে এগিয়ে এল।

সুপ্রভাত স্যার। আপনি আবার আসায় খুশী হলাম। পানীয় দেব না লাঞ্চ করবেন?

রাম আর একটা কোক দাও। আমি বললাম।–মাদাম কোথায়?

বার-এর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, যেকোন সময় এসে যেতে পারে স্যার?

আমাকে পানীয় দিয়ে গেল। আমি আধঘণ্টা ধরে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। এমন সময় মাদাম ঢুকে কাউন্টার থেকে আমাকে হাত নাড়ল। আমিও হাত নাড়াতে মাদাম আমার সঙ্গে করমর্দন করল এবং বসল।

–আপনাকে আবার দেখে আমি খুশী হলাম। আশা করি সেই মেয়েটা আপনাকে সেদিন আনন্দ দিতে পেরেছে।

আমি তেতো হাসি হাসলাম।

–সেদিন আপনি আমাকে ঠকিয়েছিলেন। আপনি জানতেন মেয়েটা জো-অ্যান ছিল না।

একজন ওয়েটার মাদামের সামনে একগ্লাস দুধ রেখে চলে গেল।

–এটা আমার একটু ভুল হয়ে গেছে। তবে ও তো জো-অ্যানের চেয়েও আকর্ষণীয় ছিল। আমি ভেবেছিলাম এতে আপনি কিছু মনে করবেন না।

–যাক এবার আমি আর একজন মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই। মু-হাই-তন। আপনি তাকে চেনেন?

হঠাৎ ওর মুখ ফ্যাকাশে, ভাবলেশহীন হয়ে গেল। তারপর বলল, এ মেয়েটি সত্যিই খুব ভাল। আপনার খুব পছন্দ হবে।

তবে একটা কথা। ওকে প্রমাণ করতে হবে যে ও মু-হাই-তন। ওকে আমার বিশেষ প্রয়োজন, কিছু কথা আছে।

মাদাম কিছুক্ষণ চিন্তা করল।

–ঠিক আছে। প্রমাণ করবে। আপনি কি এখনই তার সঙ্গে দেখা করতে চান?

না এখনই নয়। আজ রাত আটটার সময় আপনি ওকে এখানে আনতে পারবেন?

মাদাম মাথা নাড়ল।

–শুনুন মাদাম, মেয়েটা যদি সত্যিই মু-হাই-তন হয় এবং আমার সঙ্গে সহয়োগিতা করে তবে আমি আপনাকে পঞ্চাশ হংকং ডলার দেব।

–ঠিক আছে সঠিক মেয়েকেই আপনি পাবেন এবং ও আপনার সঙ্গে সহযোগীতা করবে।

আমি পানীয় শেষ করলাম এবং উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ঠিক, আজ রাত আটটায়। আমি কিন্তু ঠিক জানতে পারব মেয়েটা আসল কিনা। কাজেই আগের বারের মত।...

মাদাম হাসল।

গাড়ি চালিয়ে রিপালস-বে-তে ফিরে এলাম। সারাদিনটা নেহাৎ বৃথা কাটল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৩.১

ফেরি বোটের প্রথম শ্রেণীর ডেকের রেলিং-এ ঝুঁকে আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের লোয়ার ডক-এ ওঠার জন্যে মারামারি, ঠেলাঠেলি দেখছিলাম।

বেশ আকর্ষণীয় দৃশ্য। প্রত্যেক যাত্রীই, এর সকলেই চীনা, এমন তাড়াহুড়ো করছে, যেন বোটটা এখুনি ছেড়ে দেবে, যদিও ওটার ফেরি ছাড়তে এখনও পনের মিনিট বাকী। কুলীরা জেটির তক্তার ওপরে এমন ঠেলাঠেলি করছে যেন এই ভীড় বোটের কামরায় উঠতে না পারলে তাদের জীবনই বৃথা। চীনা মেয়েরা, পিঠে বাচ্চা বাঁধা সঙ্গে অল্প বয়সের কিছু শিশু জেটির তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে বোটে ওঠার চেষ্টা করছে। একটা অর্ধ-উলঙ্গ চীনা জোয়ান, ভারী মাল বয়ে তার কাঁধটাই ঝুলে গেছে একপাশে, ঐ ঝোলা কাঁধেই মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দুটো চীনা পুলিশ বেল্টে হাত লাগিয়ে সহনশীলতার সঙ্গে এই দৃশ্য দেখছে। আমি চোখ ফিরিয়ে প্রথম শ্রেণীর সহযাত্রীদের দিকে তাকালাম, দু-একজন করে ঢুকছে, কিন্তু স্টেলার কোন চিহ্ন নেই। তবে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ও খুব তাড়াতাড়ি আসবে না বা খুব দেরী করবে না। শেষ সময়ে আসবে।

একটা চীনা লোক, খুব ভাল স্বাস্থ্য, পরণে কালো সুট, একটা ভারী ব্রিফকেস নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে ওঠার জন্যে জেটির তক্তার ওপর দাঁড়াল। লোকটাকে দেখেই আমার এনরাইটদের বাড়িতে আয়নায় দেখা লোকটার কথা মনে পড়ল।

লোকটার বয়স চল্লিশের মধ্যে, শরীর বেশ মজবুত, জিমন্যাস্টদের মত স্বচ্ছন্দে হাঁটাচলা করতে পারে।

আমি মনে মনে ভাবলাম ও হয়তো আয়নায় দেখা লোকটা নাও হতে পারে। সব চীনাদেরই তো একরকম দেখতে। লোকটা আমাকে পেরিয়ে, সীটে বসে একটা খবরের কাগজ খুলে নিজেকে আড়াল করল।

বোট ছাড়ার ঠিক এক মিনিট আগে স্টেলাকে দেখতে পেলাম। পরনে আপেল-সবুজ সুতীর পোষাক, হাতে একটা বেতের ঝুড়ি। আমাকে দেখে হাত নাড়ল। ওই ছিল বোটের শেষ যাত্রী।

আমি গিয়ে ওর হাত থেকে ঝুড়িটা নিলাম। ও ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বোট ছেড়ে দিল।

–হ্যালো স্টেলা। আমি বললাম।

–হ্যালো। আমি ঠিক সময়েই এসে গেছি।

আমরা ডেকের বেঞ্চ-এ বসে কথাবার্তা বললাম। ব্যক্তিগত কোন কথা উঠল না এমনকি জেফারসনের নামও উচ্চারিত হল না। স্টেলা জিজ্ঞেস করল সারাদিনটা আমি কিভাবে কাটিয়েছি। আমি বললাম, কস্থা দেখে কাটিয়ে দিয়েছি।

–আমরা, এসে গেছি। ঠোঁটটা সিলভার মাইন জেটিতে এসে লাগলে স্টেলা বলে উঠল, এই জিনিষগুলো এখানে আমার প্রিয় সেই বৃদ্ধাকে দিয়ে আসতে হবে। একটু কথাবার্তা

বলে দেড়ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবো। আপনি জলপ্রপাতটা দেখে আসুননা। এটা এখানকার একটা দেখার মত জায়গা।

-হ্যাঁ, আমি দেখতে যাবো। আমরা কখন এখানে এসে মিলিত হবো?

–ফেরার বোট পাওয়া যাবে ঠিক ছটায়। ঐ সময়ই মিলিত হব।

স্টেলা আমাকে জলপ্রপাত যাবার পথনির্দেশ দিল।

–এই পথ দিয়ে সোজা গেলে বাটারফ্লাই পাহাড়, তারপর একটা ব্রীজ দেখতে পাবেন, সেটা পেরোলেই আরেকটা ব্রীজ। এই দ্বিতীয় ব্রীজটার পরেই জলপ্রপাতটা দেখতে পাবেন। এটা সত্যিই দেখার মত জায়গা।

-ঠিক আছে। আমি ঠিক দেখে নেব। আমি হেসে জবাব দিলাম।

আমি ওর চলে যাওয়া লক্ষ্য করলাম। ঘাট পেরিয়ে দুরে এক সারি জীর্ণ বাড়ির দিকে নয়ন মনোহর ভঙ্গীতে হেঁটে চলে গেল। তারপরআমিচারদিকেতাকিয়ে সেইচীনা লোকটাকে খুঁজলাম। কিন্তু কোথাও দেখতে পেলাম না। আমাদের সঙ্গেই তো নামল। এর মধ্যে ও কোথায় গেল?

এখন থেকে ছটা পর্যন্ত আমার কিছু করার নেই। পরিষ্কার আবহাওয়া, রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, কোন তাড়া নেই, তাই স্টেলার দেওয়া পথনির্দেশ ধরে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম।

একটা নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে একটা গ্রাম পেরিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার ডানদিকে বাটারফ্লাই পাহাড়। তারপর দুটো ব্রীজ পেরোলাম।

জলপ্রপাতটার কাছে চলে এলাম। সত্যিই প্রশংসা করার মতো প্রপাত। ফিরে যাওয়া মনস্থ করলাম। আর ঠিক সেই সময়ে কানের পাশ দিয়ে ভীমরুলের মত আওয়াজ করে কিছু একটা বেরিয়ে গেল এবং তারপরেই একটা রাইফেল ছোঁড়ার আওয়াজ।

আমি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়লাম। এই কায়দাটা আমি সেনাবাহিনীতে থাকার সময় শিখেছিলাম। পরক্ষণেই আবার গড়িয়ে রাস্তার ধারে আসতেই আবার গুলির আওয়াজ। কিছুটা ধুলো উড়ে এলো।

আবার গড়িয়ে পাশের ঘন ঘাসের ওপর গিয়ে পড়তেই রাইফেলের গুলি এসে পড়তে লাগল। মাথার খুব কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রায় খতম করে দিয়েছিল।

নিজের বুকের ধুকপুকুনি শুনতে পাচ্ছি। ভয়ে ঘেমে চান হয়ে গেছি। দেরী না করে গড়িয়ে একটা পাথরের আড়ালে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম।

অনেকক্ষণ কিছু ঘটল না। আমিও একটু ধাতস্থ হলাম। যে আমাকে গুলি করছে মনে হয় সে টেলিস্কোপিক লেন্স ব্যবহার করেছিল। কেননা গুলির আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে সিকি মাইল দূর থেকে ছোঁড়া হচ্ছে।

আমার পয়েন্ট থ্রী এইট রিভালভারটা না আনার জন্যে নিজেকে গালাগাল দিলাম। আমি খুব সাবধানে মাথা তুলে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম, পালাবার কোন

রাস্তা আছে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখের পাশ দিয়ে একটা গুলি বেরিয়ে গেল। আমি মাথা নামিয়ে নিলাম। তাহলে ওরা দুজন আছে। শেষ ওলিটা আমার পেছন থেকে এসেছে।

আমার পোষাক দেখে ওরা বুঝেছে যে আমার সঙ্গে অস্ত্র নেই। ওরা দুজনেই সশস্ত্র।

খুব আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে বড় ঘাসগুলোর ভেতর দিয়ে সাপের মত পাহাড়ের তলদেশের দিকে মিনিট পাঁচেক ধরে এগোতে লাগলাম। এবার খুব সন্তর্পণে মাথা তুলতেই মাথার পাশ দিয়ে একটা বুলেট চলে গেল। আবার সটান হলাম। আস্তে আস্তে আগের জায়গাটা ত্যাগ করলাম। ভগবানকে ধন্যবাদ! প্রায় সেই মুহূর্তে আমার আগের জায়গাটায় একটা বুলেট ছুটে এল এবং একটা রাইফেলের ফায়ারের আওয়াজ পেলাম।

আমি আবার ডানদিকে একটু একটু করে সরতে লাগলাম। এরপর বড় ঘাস আর নেই। এরপর উপত্যকা অঞ্চল।

আমি মাথা না তুলে মাটিতে কান চেপে ভারতীয় কায়দায় শুনতে চেষ্টা করলাম। প্রথম কয়েক মিনিট পেরোবার পর আমার ডাইনে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর থেকে আমার দিকে কেউ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে শুনতে পেলাম। খুব শীগগির ও এসে পড়বে।

আমি ভাবলাম মৃত্যুর কাছে এবার আমায় আত্মসমর্পণ করতেই হবে। নিজেকে কেমন অক্ষম মনে হল। পরক্ষণেই মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে প্রথমে ডানদিকে তারপর বাঁ-দিকে লাফ দিলাম। উদ্দেশ্য ছিল লোকটাকে বোকা বানানো। সফল

হলাম। রাইফেলটা গর্জে আমার কয়েক গজ দূর দিয়ে গুলিটা চলে গেল। আমার সামনের ঘাসে একটা নড়াচড়া দেখলাম। প্রায় ছ-গজ দূরে।

হামাগুড়ি দিচ্ছি। দেখি চীন, নীল জামা, ট্রাউজার, মাথায় কালো টুপি পরা একটা লোক, আমাকে দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। লোকটা বেঁটেখাটো কিন্তু মজবুত। হাতে ধরা ছুরি। আমি ওকে কোনরকম সুযোগ না দিয়ে লাফিয়ে ডান হাত দিয়ে ছুরিটা, বাঁ-হাত দিয়ে লোকটার গলাটা জাপটে ধরলাম।

আমি কাঁধ দিয়ে ওর বুকে একটা ঝাঁপটা ঝাড়লাম। ও সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। ও আঙুল দিয়ে আমার চোখ খামচে দেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু আমি আমার মাথা দিয়ে ওর মুখে মারলাম এক ধাক্কা। ও গো করে উঠল। ওর ওজন আমার অর্ধেক, শক্তিও তাই। ওর হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে ওর গলায় চাপ দিতে লাগলাম। ওর সারা শরীরটা যতক্ষণ না পর্যন্ত মোচড় দিয়ে চোখ উল্টে ঠাণ্ডা হল, ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়লাম না। ও নেতিয়ে পড়লে আমি কয়েক গজ দূরে গড়িয়ে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখলাম চীনাটার শরীর অল্প-অল্প নড়ছে। আমি হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছে গিয়ে ওর শরীরটা দিয়ে আমার শরীরটা আড়াল করে শুয়ে রইলাম।

আগের মারামারিতে ওর মাথা থেকে টুপিটা খুলে গিয়েছিল। ওর মাথায় টুপি না থাকায় ওকে আমি বলে ভুল করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুমান সত্যে পরিণত হল। রাইফেলে গুলি ছোঁড়ার শব্দ পেলাম। চীনাটার দেহটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নেতিয়ে

পড়ল। ওর নিথর, নিস্পন্দ দেহটা শুইয়ে দিয়ে আবার আমি হামাগুড়ি দিয়ে পনের গজ দূরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। হয়তো অপেক্ষা করতে করতে লোকটার ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। অবশেষে ও এল।

নিজের ওপর যথেষ্ট আস্থা নিয়ে ও এগোচ্ছে। দু-হাতে ধরা রাইফেল। আমার দিকেই মুখ ফেরানো। মশু, সুগঠিত চেহারা। পরনে কালো সিটি স্যুট। এই সেই এনরাইটদের আয়নায় দেখা লোকটা।

ওকে আসতে দেখে আমার সারা শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল। আমি বুঝলাম স্টেলার এই নির্জন দ্বীপে আসার প্রস্তাবটা, বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানো এ-সবই একটা পরিকল্পিত ফাঁদ। এই ফাঁদের থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই।

ঘাসের মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগলাম হামাগুড়ি দিয়ে। হাতে ছুরি আছে বটে কিন্তু রাইফেলের সঙ্গে ছুরি! হাতের কাছে একটা পাথর পেয়ে নিয়ে রাখলাম।

লোকটা এবার আমার খুব কাছে, আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমি ডান হাতে পাথর আর বাঁ-হাতে ছুরি নিয়ে অপেক্ষা করছি।

আমার ধারণা মত ও ওর মরা দোসরকে আগে দেখতে পেল। ঝুঁকে ওকে দেখতে লাগল। একটা অস্ফুট আওয়াজ করল মুখে। তারপর চোয়াল শক্ত করে, রাইফেলটা বাগিয়ে আমাকে লক্ষ্য করল। সঙ্গে সঙ্গে আমি পাথরটা ছুঁড়লাম। ও গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু

পাথরের ধাক্কায় নিশানা সঠিক হল না। গুলিটা আমার কাঁধের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। পাথরটার একটা কোণা লেগে ওর হাত থেকে বন্দুকটা খসে পড়ল। ও নীচু হয়ে ওটা কুড়িয়ে নেবার আগেই আমি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

ও দু-পায়ে ভর দিয়ে ধাক্কাটা সামলালো। আমি উল্টে পড়লাম। ও দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আমাকে ধরার চেষ্টা করল। ইস্পাতের মত আঙুল। আমি সর্বশক্তি দিয়ে ওর তলপেটে মারলাম এক লাথি। ওর হাতটা নরম হতেই এক লাফ মেরে পাহাড়ের দিকে গিয়ে পড়লাম। খেয়াল পড়ল ছুরিটা আমার হাতে নেই। কাজেই আবার গড়িয়ে পাহাড়ের দিকে যেতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওর ছুটে আসার আওয়াজ পেলাম। যেম বুঝে শুয়োর গাঁ গাঁ করে ছুটে আসছে। আমি গড়ানো বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালাম। ওঁর হাতে রাইফেল নেই দেখে আমি পাহাড়ের দিকে ছুট লাগালাম।

লোকটা আমার পেছনে উধশ্বাসে ছুটে আসছে। ও যখন আমার খুব কাছে তখন আমি থেমে গিয়ে ওর মুখ লক্ষ্য করে এক লাথি মারলাম। ও নিজেকে সামলাবার কোন সুযোগই পেল না। গড়িয়ে পড়ল।ও গড়িয়ে পড়ার মুখে আমি একটা বড় পাথর তুলে ওর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়লাম। ওর মাথার পেছনটা ফেটে গ করে রক্তের ফোয়ারা ছুটল। হয়তো ওর মাথার খুলি গুড়ো হয়ে গেছে। ও গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। ঠিক যেন একটা কাদার তাল। যাকগে, আমি আর চিন্তা করছি না। আমাকে আর জ্বালাতন করতে আসবেনা।

বুক ভরে দম নিয়ে সিলভার লাইন জেটির দিকে হাঁটা দিলাম। কাঁধটা জ্বালা করছে। পাহাড় থেকে নেমে রাস্তায় এলাম।

.

৩.২

ঠিক আটটায় ওয়াঞ্চাই এলাকার বার-এ গিয়ে ঢুকলাম। এর আগে আমি স্নান করেছি। ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়েছি। আমার সৌভাগ্য তেমন ক্ষতিকর কিছু হয়নি।

বার একেবারে ভর্তি। খালাসীরা মদের গ্লাস নিয়ে হৈ-চৈ করছে, চীনা ছেলেমেয়েরা কেউ গল্প করছে, কেউ নাচছে।

বক্সে কান ফাটানো আওয়াজে গান বাজছে। আমি ভেতরে ঢুকে চারিদিকে তাকালাম। চীনা মাদাম ভীড় থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে একটা কেবিনে নিয়ে গিয়ে মুখোমুখি বসে খের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি খাবেন বলুন?

–একটা স্কচ...আপনি?

আমি আপনার জন্যে স্কচ বলছি। মাদাম নাচিয়েদের পেছন দিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। মিনিট পাঁচেক পর একটা ওয়েটার আমাকে স্কচ আর সোডা দিয়ে গেল। আরও মিনিট দশেক পরে চিন্তিত মুখে মাদাম ফিরে এসে চেয়ারে বসল।

–মু-হাই-তন আপনার সঙ্গে দেখা করবে, তবে এখানে নয়, আপনাকে ওর ঘরে যেতে হবে।

আবার ফাঁদ? একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। আসল কথা বিকেলের ঐ ঘটনার পর আমি একটু দুর্বল হয়ে গেছি। অবশ্য এখন আমি স্যুট পরে, পয়েন্ট-থ্রী-এইট যন্ত্রটা সঙ্গেই এনেছি। বুকে অনেকটা জোর আছে।

বুকের ঐ জোরের সঙ্গেই বললাম, কোথায় আছে ও?

-খুব দূরে নয়। আমি একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, মাদাম বলল।

–ঠিক আছে। কিন্তু আমি কি করে বুঝবো ওই আসল মেয়ে?

–ওর সঙ্গে কাগজপত্র আছে, আপনাকে দেখাবে। আপনি যাকে চাইছেন, ও ঠিক সেই মেয়ে।

–তাহলে আমি এক্ষুনি যাবো। আমি বললাম।

নিশ্চয়ই। ও আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমি তাড়াতাড়ি পানীয় শেষ করে উঠলাম।

–আমি ওর সঙ্গে যদি কথা বলে সন্তুষ্ট হই যে ও সেই মেয়ে যাকে আমি খুঁজছি, তাহলে আপনাকে পঞ্চাশ হংকং ডলার দেব।

মহিলা শক্ত মুখে হাসল।

-ঠিক আছে। চলুন, ট্যাক্সি করে দিই।

আমি অপেক্ষা করলাম। মহিলা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল আর আমাকে বলল, ট্যাক্সিওলা জানে আপনাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে। ওর ঘরটা সবচেয়ে উঁচু তলায়। আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

আমি ওকে ধন্যবাদ দিয়ে বার-এ অপেক্ষা করতে বললাম।

ট্যাক্সিচালক আমাকে দেখে হাসল। আমি গা না করে ভেতরে গিয়ে বসলাম। মিনিট ছয়েকের মধ্যে একটা গয়নার দোকানের সামনে এসে থামল। চালক তার পাশের একটা দরজা দেখিয়ে দিল। ট্যাক্সি চলে গেল।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠেদরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। দশ-পা এগোলো একটা লিফট। আমি লিফট চালিয়ে একেবারে উঁচু তলায় গেলাম। পিস্তলটা একবার দেখে নিলাম। কয়েক পা এগিয়ে একটা দরজা দেখতে পেয়ে বেল টিপলাম।

একটু দেরীতে একটা চীনে মেয়ে দরজা খুলে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

মেয়েটা লম্বা, স্লিম এবং সুন্দরী। একটা ক্রীম রঙের এমব্রয়ডারী করা সিল্ক জামা পরা, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। মাথায় ফুল গোঁজা।

–আমি রায়ান। মনে হয় তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করছ?

মেয়েটা সুন্দর ঝকঝকে দাঁতে হেসে বলল, হ্যাঁ, আসুন। ভেতরে আসুন।

ঘর বড়, সুন্দর ফুলে সাজানো। আধুনিক ওক কাঠের আসবাব। জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

–তুমি মু-হাই-তন? মেয়েটা দরজা বন্ধ করে আমার দিকে এগিয়ে এলে প্রশ্ন করলাম।

মেয়েটা চেয়ারে বসে বলল, হ্যাঁ আমার নাম। হাতদুটো ভাঁজ করে কোলে রাখা।

–আমি কী করে জানবো তুমি সত্যিই মু-হাই-তন কিনা?

আমার প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে টেবিলের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, আমার সব কাগজপত্র ওখানে আছে।

আমি ওর পরিচয়পত্র দেখালাম। পাঁচ বছর আগে হংকং-এ এসেছে। জীবিকা-নর্তকী। বয়স–তেইশ। আমি ওর ঠিক উল্টো দিকে বসলাম।

–তুমি হেরম্যান জেফারসনকে চিনতে?

–হ্যাঁ চিনতাম। হপ্তা-দুয়েক আগে ও মারা গেছে।

–ওর বউকে চিনতে? আমি প্রশ্ন করলাম।

–অবশ্যই। আমি ওদের বিয়েতে সাক্ষী ছিলাম।

–তুমি জান হেরম্যান জীবিকা অর্জন করত কিভাবে?

–আমার মনে হয় আমি আপনার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। দয়া করে বলবেন আপনি কে এবং কী জন্যে আমার কাছে এসেছেন?

–আমি হেরম্যানের বাবার হয়ে অনুসন্ধান করতে এসেছি। উনি জানতে চান ওঁর ছেলে এখানে কী ভাবে জীবনযাপন করত।

ভুরু তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ও জিজ্ঞেস করল, কেন?

-তা জানি না। উনি আমাকে টাকা দিয়েছেন, এইসব খবর সংগ্রহের জন্যে। তুমি কিছু খবর দিলে তোমাকেও টাকা দেব। মেয়েটা মাথা ঝাঁকাল।

–আপনি আমায় কত টাকা দেবেন?

–সেটা নির্ভর করছে তুমি আমাকে কী রকম খবর দাও তার ওপর।

–আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ও কি করত? একটু তেতো হেসে বলল, ও কিছুই করত না। জো-অ্যান-এর কাছ থেকে টাকা নিয়ে খেত।

–লেইলা বলে কোন মেয়েকে চেনো?

–হ্যাঁ। ও তো জো-অ্যানের সঙ্গেই থাকত।

–লেইলা আমাকে বলেছিল হেরম্যান রিপালস্ উপসাগরের কাছে একটা অট্টালিকা ভাড়া করে থাকত। সত্যিই কি ও অট্টালিকা ভাড়া করেছিল?

মেয়েটা হো হো করে হেসে বলল, জেফারসন সেলেশিয়াল হোটেলের ভাড়াই দিতে পারত না। একটা অকর্মার ধাড়ি...ভিখিরী।

–আমি শুনেছিলাম ও মাদকদ্রব্য চোরাচালান করত?

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার মুখটা শক্ত হয়ে গেল। তারপর একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থেকে একটু সহজ হয়ে বলল, এসব চোরাচালানের ব্যাপারে আমি কিছু জানিনা।

–আমি বলছিনা যে তুমি এসব কর। তুমি শুনেছ, ক্যান্টন থেকে হেরোইন হংকং-এ চালান। হয়?

না। মেয়েটা বলল।

–ফ্র্যাংক বেলিং কিন্তু এই চোরাচালান করত।

–আমি এ ব্যাপারে কিছু জানিনা। ও আমাকে খুব গভীর ভাবে লক্ষ্য করতে করতে বলল।

–তুমি বেলিংকে চিনতে, তাই না?

–আমি একবার মাত্র ওকে দেখেছিলাম, জেফারসনের বিয়েতে।

–ও কি জেফারসনের বন্ধু ছিল?

–বোধহয়, ঠিক জানি না। আমি কিছু জানি না এ ব্যাপারে।

–আমি এও শুনেছি বিয়ের পর জেফারসন ওর বৌকে ছেড়ে রিপালস্ উপসাগরের ঐ বাড়িতে চলে যায়।

মেয়েটা ছটফট করতে লাগল।

বললাম তো মরার আগের দিন অবধি হেরম্যান সেলেশিয়ালেই থাকত জো-অ্যানের সঙ্গে। ও কোনদিন রিপা যায়নি।

আমি ওকে সিগারেট দিতে গেলাম। ও নিলো না। ভাবলাম এ প্রসঙ্গে আর প্রশ্ন করে লাভ নেই। সবাই একই কথা বলছে, শুধু লেইলা ছাড়া। তবে আমি এটাই ধরে নিতে পারি লেইলা মিথ্যে বলেছে।

-ঠিক আছে। আমরা জো-অ্যানকে নিয়ে আলোচনা করি। তুমি ওকে ভালভাবে চিনতে?

-হ্যাঁ। ও আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল। ও আমেরিকা চলে যেতে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আশা করছি খুব শিগগির চিঠি পাবও বলে গেছে আমার জন্যে ও কিছু করতে পারলে জানাবে। আমিও তাহলে আমেরিকা চলে যাবো।

আমি ভাবলাম এবার খোলাখুলি ভাবে আলোচনা দরকার।

-তুমি তাহলে শোননি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

–শুনব..কী?

–ও মারা গেছে।

ও ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। হতবিহ্বল হয়ে বুকে হাত ঠেকাল। অভিনয় নয় সত্যিই ও ভয়ানক শক পেয়েছে।

মারা গেছে? কী করে? কি হয়েছিল?

–প্যাসাছোনা সিটিতে পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ও খুন হয়। ওর চোখে মুখে যন্ত্রণার ছাপ।

-আপনি মিথ্যে বলছেন।

–আমি সত্যিই বলছি। পুলিশ ওর খুনীকে ধরার চেষ্টা করছে।

ও কান্নামিশ্রিত গলায় বলল, বলে যান। দয়া করে আমাকে সব বলুন।

ব্যাপারটা একটু সহজভাবে নাও। আমি বললাম, আমার খুব খারাপ লাগছে কেননা দুঃখজনক খবরটা আমিই তোমাকে দিয়েছি। আমি নিজেও খুনের ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করছি, আর তুমি আমাকে যথাসম্ভব সাহায্য কর। এখন শোন...।

কথার মাঝখানেও হঠাৎলাফিয়ে উঠে পাশের ঘরে চলে গিয়ে দড়াকরেদরজাবন্ধ করে দিল। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে লিফটে করে পরের তলায় নেমে চুপচাপ অপেক্ষা করলাম। কয়েক মিনিট পরে ওর ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেলাম। খানিকক্ষণ পর আবার মজা বন্ধ করার শব্দ পেলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে ওপর তলায় এসে ওর দরজায় কান পাতলাম। কিছুক্ষণ পর টেলিফোন ডায়ালেরশব্দ এবংতারপর খুবনীচু গলায় চটপটুকাউকেকিছুবলার আওয়াজ পেলাম। আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে কোলাহলমুখর রাস্তার উল্টোদিকে এলাম। সেখানে একটা ক্যামেরার দোকানের শো-কেস-এখুবকমদামীএকটাক্যামেরা দেখার ছলকরেকাছেমু-হাই-তন-এরবাড়ির দরজার প্রতিচ্ছবির দিকে লক্ষ্য রাখছিলাম। প্রায় মিনিট দশেকঅপেক্ষাকরেওসব আশা ছেড়ে দিয়ে। যখন চলে যাব ভাবছি, ঠিক তখনই দেখলাম ও পোষাক পরিবর্তন করে, কালো কস্টিউম আর ট্রাউজার পরে, রাস্তায় এসে খুব সন্তর্পণে এদিক-ওদিক চেয়ে সমুদ্র এলাকার দিকে হাঁটা লাগাল। আমিও ওকে অনুসরণ করে চললাম।ও একটা ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে এসে ড্রাইভারকেকিছুবলল, তারপর ট্যাক্সিতে উঠে বসল। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল।

আমারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। স্ট্যান্ডের দ্বিতীয় ট্যাক্সির ড্রাইভারকে মোটামুটি ভাবে ইংরেজীতে বোঝাতে পারলাম যে সামনের ট্যাক্সিটাকে অনুসরণ করতে হবে তাহলে ওকে আমি কুড়ি হংকং ডলার দেব। ট্যাক্সিতে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার জোরে ছেড়ে দিল, মুহাই-তন এর থেকে আমার ট্যাক্সিটা গজ পঞ্চাশেক দূরে।

ওর ট্যাক্সিটা স্টার ফেরি স্টেশনেএসে থামল, ও ট্যাক্সি থেকে নেমে এগোতে থাকল, আমিও ওর পেছন পেছন ঘাটে এলাম। ও ফেরিঘাটের থার্ড ক্লাসে, আমি ফার্স্ট ক্লাসে উঠলাম। বোট আমাদের কউলুন সিটি জেটিতে নামিয়ে দিল। সামনেই কাই-তাক এয়ারপোর্ট।

ফেরিঘাট থেকে ও একটা রিক্সা নিল। আমি ভাবলাম এই ভীড় রাস্তায় হেঁটে গেলেই বোধহয় ওকে চোখেচোখে রাখতে পারব। কিন্তু এটা আমার খুব ভুল হল। ওর রিক্সা চালক খুব জোরে রিক্সা চালাচ্ছিল, ওকে লক্ষ্য রাখতে ঐ ভীড় রাস্তার মধ্য দিয়ে আমাকে ছুটতে হচ্ছিল। চীনারা হয়তো ভাবছিল আমি একটু ক্ষ্যাপাটে, যাইহোক, ওকে ধরলাম অতি কষ্টে।

একটা সরু রাস্তার সামনে রিক্সা থেকে নেমে ও একটা সরু নোংরা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি জানতাম এই রাস্তা দিয়ে পাঁচিলঘেরা কউলুনের পুরোনো শহরে যেতে হয়।

বস্তুতঃ হংকং-এর এই এলাকাটা রেড চীনাদের একটা বড় ঘাঁটি। ব্রিটিশ আমল থেকেই এখানে খুনী, অপরাধী, নেশাখোরদের আস্তানা ছিল। অবস্থা এখন আয়ত্ত্বের বাইরে চলে যাওয়ায় দিনরাত পুলিশ এখানে টহল দেয়। ইউরোপীয়রা এখানে ঢুকতে পারেনা বা আসতেও চায়না।

আমি ওর পেছন পেছন চললাম। ঐ সরু নোংরা গলিতে হঠাৎ লুকিয়ে পড়া সম্ভব ছিল না। ও পেছন ফিরলেই আমাকে দেখতে পেত কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাকায়নি। আমি ওর

থেকে গজ কুড়ি পেছনে ছিলাম। নেশাগ্রস্ত চীনাগুলো আমার দিকে একবার করে তাকিয়ে এমনভাবে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল যেন আমি অস্পৃশ্য।

হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটা একটা দরজার সামনে এসে থামল। তারপর দরজাটায় ধাক্কা মেরে ঢুকে গেল ভেতরে। আমি কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম। বেশ কিছু চীনা আমাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করছে। যদিও ওদের মুখগুলো নেশাগ্রস্থ, ফ্যাকাসে। আমার মনে হচ্ছিল এরা শুধুশূন্যদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েই আছে। ঠিক দেখার দৃষ্টি দিয়ে দেখছে না। তবু একটা ভয়ের স্রোত আমার মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে গেল।

আমিও ঠেলা মেরে দরজাটা খুললাম। ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। একটা মেয়ের অস্পষ্ট গলা আমার কানে এল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠলাম।

আমার ঠিক সামনের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে একটা লোকের গলা শুনতে পেলাম, দেখ শালী, হলদে চামড়ার বাচ্চা, যদি মিথ্যে বলিস আমি তোকে মেরে ফেলব। উচ্চারণটা আমেরিকান।

–লোকটা আমাকে তাই বলেছে, মু-হাই-তনের কাঁপা গলার স্বর শুনলাম।ও বলছে, লোকটা আমাকে বলেছে, প্যাসাডোনা সিটিতে পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ও খুন হয়।

আমার ঠিক পেছনে খুব ঠাণ্ডা, ভারী চীনা গলার আওয়াজ পেলাম, একদম নড়বেন না, মিঃ রায়ান। স্বরটা শুনে আমি লোকটাকে চিনতে পারলাম না।

আমি না নড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

দয়া করে কোন বেয়াড়াপনা না করে দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকুন। আপনার পেছনে আমার হাতে একটা পিস্তল আছে। আমি এক-পা এগিয়ে দরজায় একটা ঠেলা মারলাম, দরজা খুলে গেল।

একটা নোংরা খালি ঘর। একদিকে কাঠের বেঞ্চ। আর এক কোণে একটা প্যাকিং বক্স-এ ওপর একটা পোড়া কেটলী আর কতগুলো নোংরা চায়ের কাপ। দেওয়ালে একটা হকে একট। তোয়ালে, ঠিক তার তলায় একটা বেসিন।

ঘরের মেঝেতে চোখ পড়তে দেখি মু-হাই-তন আর একজন রোগা, খবুটে চেহারা, পরনে ময়লা চীনাদের পোশাক, মাথায় কালো টুপী পরা একজন ইউরোপীয় লোক বসে। আমাকে দেখে মু-হাই-তন চীৎকার করে উঠল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ চেপে ধরে এক ঠেলা মেরে আমার পায়ের কাছে ফেলে দিলো।

চুপ খচ্চরী। মেরে ফেলব। তারপর আমার পেছনের লোকটাকে বলল, তুমি একে এখানে এনেছো কেন? যাও বেরিয়ে যাও।

–আপনি আরো ভেতরে ঢুকে যান মিঃ রায়ান।আমার পেছনের লোকটা বলল। আমি আমার পিঠে পিস্তলের স্পর্শ পেলাম।

মেয়েটা হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এক দৌড়ে সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল। আমার দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে কয়েকবার তাকিয়ে গেল।

আমি কথামতো আরো ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। লোকটা আমার দিকে একদৃষ্টে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আমি এক ফাঁকে পেছন ফিরে আমার পেছনের লোকটাকে দেখে নিলাম। ওয়ং-হপ-হহ, আমার সেই ইংরেজী বলিয়ে গাইড যেন অনুতপ্ত হয়েছে, সেইভাবে মৃদু হাসল। ওর ডানহাতে ধরা পয়েন্ট-ফোর-ফাইভ কোল্ট রিভলভার আমার পিঠে ঠেকান।

আমার সামনের লোকটা অত্যন্ত নোংরা দেখে মনে হল অধভুক্ত এবং অসুস্থ। দাড়ি কামায় নি, গা দিয়ে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। ঐ লোকটা ওয়ংকে বলল, দেখ ওর কাছে কোন অস্ত্র আছে কিনা।

ওয়ং আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গা খুঁজে আমার রিভালভারটা বের করে নিল, তারপর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

আমার মনে হল আমার সামনের লোকটা ফ্রাংক বেলিং। এছাড়া অন্য কেউ নয়।

—আপনি বেলিং? আমি প্রশ্ন করলাম, আমি আপনাকে খুঁজছি।

-খুব ভাল কথা, তা আমাকে তো পেয়ে গেছেন। তবে আপনার এতে খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয়না।

আমি ওয়ং-এর দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি তোমার কথা ভাবছি, সেই এয়ারপোর্ট থেকেই তুমি আমাকে ধাওয়া করেছে। আমার এ ব্যাপারটা লক্ষ্য না করে খুব বোকামী হয়েছে। কী করে খবর পেলে আমি এখানে আসছি?

ওয়ং খিলখিলিয়ে হেসে জবাব দিল, খবর কি আর পাওয়া যায়, খবর রাখতে হয়। আপনার এখানে আসা একদমই উচিৎ হয়নি।

কী আর করা যাবে, এসে যখন পড়েছি, আমি বললাম, আর আমার কাজটাই কৌতূহলী হওয়া।,

–আপনি কী চান? বেলিং প্রশ্ন করল।

জো-অ্যানকে কেন খুন করা হয়েছে আমি সেটা জানতে এসেছি। এখানে সে সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে দেশে ফিরে যাব।

-তাই নাকি, ও মারা গেছে? বেলিং বলল।

হ্যাঁ,..সে মারা গেছে,

মাথা থেকে টুপীটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, রোগা শিকের মত আঙুলগুলো দিয়ে চুলে একবার হাত চালিয়ে বলল, ও কী করে মারা গেল?...আমাকে পুরো ঘটনাটা বলুন।

আমি সেই ভুতুড়ে টেলিফোন থেকে শুরু করে সংক্ষেপে পুরো ঘটনাটা ওকে বললাম। আমি ওকে এও বললাম যে মিঃ জেফারসন অ্যানের খুনীকে খুঁজে বের করার জন্যে

আমাকে নিয়োগ করেছেন। আমি আরো বললাম, উনি বলেছেন ওঁর ছেলে বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই জো-অ্যানের খুনীকে খুঁজে বের করত। সুতরাং সেই কাজটুকু অন্ততঃ তার করা উচিৎ বলে তিনি মনে করেন।

বেলিং বলল, পুলিশ কেন খুনীকে খুঁজে বের করছেনা?

–ওরা খুঁজে পাচ্ছেনা। অবশ্য আমিও এখনও কোন কিনারা করতে পারিনি। তাই আপনাকে খুঁজছিলাম।

কী করে ভাবছেন যে আমি আপনাকে সাহায্য করব? বলতে বলতে বেলিং ওর রোগা ভাঙ্গা গালের ঘাম মুছল। গলা শুনে মনে হল বেশ ভয় পেয়েছে।

আপনি আমাকে হেরম্যান জেফারসন সম্বন্ধে কিছু জানাতে পারেন? সেও কি আপনার এই মাদকের চোরাচালানের দলে ছিল?

আমি জেফারসন সম্বন্ধে কিছু জানিনা। জেফারসন মারা গেছে ও মৃতই থাকুক। আপনি এখন এখান থেকে বেরিয়ে যান।

আমার অসতর্কতায় আমাকে ভুগতে হল।

আমি দেখলাম বেলিং, ওয়ং-কে ইশারায় কিছু বলল আর আমি বেরোবার জন্যে ঘুরতেই ওয়ং পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে আমার তলপেটে সজোরে আঘাত করল, তারপর আমি

যন্ত্রণায় কাতরে উঠতে পিস্তল-এর বাঁট দিয়ে আমার মাথার ঠিক মাঝখানে একটা আঘাত করল।

.

৩.৩

আমি যেনকাউকে খুব আস্তে আস্তে বলতে শুনলাম, ফ্রাংক বেলিংইংরেজ, তাইনা?সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গলা মনে হল যেন চীফ-ইন্সপেক্টর ম্যাকার্থীর গলা, উত্তর করল, হা...ও ইংরেজ।

কিন্তু ঘোরের মধ্যেও আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না ঐ বোগা, নোংরা, আমেরিকান ঢং এ ইংরেজী বলিয়ে লোকটা একজন ইংরেজ হতে পারে।

মাথায় তীব্র যন্ত্রণা চাগাড় দিয়ে সব চিন্তা আমার ভণ্ডুল হয়ে গেল।

চোখ খুলে দেখলাম গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছি। নাকে পরিচিত গন্ধ পেয়ে বুঝলাম, আমি–সেখানেই আছি। মাথায় হাত দিতেই তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলাম। আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। দেওয়াল ধরে হাতড়ে হাতড়ে দরজা খুঁজে পেয়ে বাইরের বারান্দায় বের হলাম। ওখানে মৃদু আলো রয়েছে। আর নীচে গলিতে শুনতে পেলাম কিছু চাপাকণ্ঠস্বর। হাতের ঘড়িটা দেখলাম। মাঝরাত পেরিয়ে পাঁচ মিনিট হয়েছে। তার মানে আমি আধঘণ্টার মতো অজ্ঞান ছিলাম।

এই এতক্ষণ সময়ের মধ্যে বেলিং আর ওয়ং-এর পালিয়ে যেতে কোন অসুবিধাই হয়নি, এতে কোন সন্দেহ নেই।

সিঁড়ির দিকে এগোতেই কেউ সিঁড়ি দিয়ে উঠছে শব্দ পেলাম। কোটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে শুধু খাপটা হাতে ঠেকল। এক ঝলক তীব্র আলো চোখে এসে পড়ল। আপনি এখানে কি করছেন। পরিচিত স্কটিশ গলা।

–এই একটু ঘুরছি। বেশ রসিয়ে জবাব দিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এখানে কি মনে করে?

সার্জেন্ট হ্যামিশ আর একজন চীনা পুলিস অফিসার ওপরে উঠে এল।

–আপনার একটু দেরী হয়ে গেল। আমি এতক্ষণ একাই আপনার বন্ধু বেলিং-এর সঙ্গে কথা বলছিলাম।

–ফ্রাংক বেলিং? রীতিমত উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করল, কোথায় সে?

–পালিয়েছে। আমার মাথার পেছন দিকটা দেখিয়ে বললাম, ওর একটা চীনা দোসর আমার সঙ্গে একটু ইয়ার্কি করেছে। হ্যামিশ ওর ফ্লাশলাইট দিয়ে ক্ষতস্থানটা দেখে আঁতকে উঠল।

উঃ! নিজের চোখে দেখলেন? হংকং-এর সবচেয়ে নোংরা এলাকা। আমার পাশ দিয়ে সে ঘরের ভেতর ঢুকে সব জায়গায় আলো ফেলে বেরিয়ে এল।

চীফ ইন্সপেক্টর আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন। চলুন, যাওয়া যাক।

-উনি আমার সঙ্গে ছাড়াও চীনা মেয়ে মু-হাই-তন-এর সঙ্গেও কথা বলতে চাইবেন। এই নিন ওর ঠিকানা-আর তাড়াতাড়ি যান, নইলে উড়ে যাবে। আমি হ্যামিশকে ঠিকানা দিলাম।

–ওর সঙ্গে ঐ মেয়েটার কী সম্বন্ধ আছে?

–ওকে অনুসরণ করেই আমি বেলিং-এর খোঁজ পেয়েছি। তাড়াতাড়ি করুন,নইলে পালাবে।

সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিসটাকে ক্যান্টনীজ ভাষায় কী যেন বলল। সে বলল, আসুন আমরা এগোই। আমি ওর কথামতো নীচে নেমে সেই অন্ধকার, নোংরা গলি দিয়ে পুলিসটাকে অনুসরণ করে এগোতে লাগলাম।

আধঘণ্টা পরে আমরা চীফ ইন্সপেক্টর ম্যাকার্থীর অফিসঘরে পৌঁছলাম। রেডিও টেলিফোনে ওকে ওরা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে এসেছে বলে বেশ অখুশী মনে হচ্ছে। মাথার যন্ত্রণাটা কষ্ট দিচ্ছে। আমাদের সামনে দুকাপ চা রাখা আছে। চা-টা খেয়ে অনেকটা চাঙ্গা মনে হল নিজেকে।

সার্জেন্ট হ্যামিশ দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত খুঁটছে আর আমাকে লক্ষ্য করছে।

ম্যাকার্থী ওর পাইপ অন্যমনস্কভাবে টানতে টানতে আমার কাছে পুরো ঘটনাটা শুনল। আমি অবশ্য সিলভার বের ঘটনাটা বাদ দিয়ে, (কেননা আমি জানি তাহলে ব্যাটা ক্ষেপে যাবে) ওকে কিভাবে মাদাম-এর মাধ্যমে মুন-হাই-নকে পাকড়াও করলাম এবং জো-অ্যান এর মৃত্যু সংবাদ শুনে ওর প্রতিক্রিয়া সব খুলে বললাম।

আমি বললাম, আমার ধারণা ছিল ও জো-অ্যান-এর মৃত্যুসংবাদ শুনে হয়ত পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে, তাই রাস্তার ধারে অপেক্ষা করে ওর পিছু নিয়ে নিয়ে ঐনরকে গিয়ে ঢুকলাম। আমি ম্যাকার্থীকে ঐনরকে কিভাবে ওয়ং-আবির্ভূত হল এবং বেলিং-এর সঙ্গে ওর কথাবার্তা এবং তারপর ওয়ং আমাকে কিভাবে আঘাত করল সব বললাম। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে আমার কথাগুলো শুনে ম্যাকার্থী বলল, এসবের আগে আমাকে জানানো উচিত ছিল আপনার।আমি ওরকথা এড়িয়ে গেলাম।

ম্যাকার্থী কিছু চিন্তা করতে লাগল। এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। খুব তাড়াতাড়ি ফোন তুলে নিয়ে কথা শুনল। তারপর বলল, ঠিক আছে, নজর রাখো। মেয়েটাকে আমার চাই।

আমি মনে মনে হাসলাম এজন্য যে, ঐ মেয়েটা নিজের ঘরে বসে থাকবে বা ফিরে আসবে ম্যাকার্থীর কাছে। তবে একটা কথা ভেবে শিউরে উঠলাম, ওর আবার লেইলার মত অবস্থা হবে না তো?

মেয়েটা এখনও ওর ঘরে ফিরে আসেনি, তবে আমরা ওর ঘরের ওপর নজর রাখছি এবং অন্যত্রও খুঁজছি। আমার দিকে চেয়ে ম্যাকার্থী বলল।

–আপনার কাছে ফ্রাংক বেলিং-এর কোন ফটো আছে? আমার মনে হচ্ছে ঐ লোকটা একজন আমেরিকান, ও বেলিং নয়। আমি বললাম।

ম্যাকার্থী আগের তুলনায় একটু বেশিই আগ্রহ দেখাচ্ছে। আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে ড্রয়ার খুলে পেটমোটা একটা ফাইলের ভেতর থেকে একটা খাম বের করে হাফ-প্লেট সাইজের একটা ফটো আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। ফটোটা দেখে আমি একেবারে খ মেরে গেলাম। এ একেবারে সেই ফটো যা আমাকে জেনেৎ ওয়েস্ট দিয়েছিল। যে ফটোটা দেখিয়ে জেনেৎ বলেছিল এই হচ্ছে হেরম্যান জেফারসন।

–আপনি কি নিশ্চিত যে এ ফ্রাংক বেলিং?

ম্যাকার্থী আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, নয় তো কি? এটাই তো ওর পুলিস ফটোগ্রাফ। আমরা ওকে ধরার যখন ঠিক করেছিলাম, তখন কাগজেও এর অনেক কপি বেরিয়েছিল। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ফ্রাংক বেলিং।

কিন্তু আমি যার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তার সঙ্গে এর তো কোন মিল নেই। ও নিজেকে বলেছিল ফ্রাংক বেলিং।

ম্যাকার্থী খানিকটা চা খেয়ে পাইপ ভরতে ভরতে আমার দিকে খানিকটা অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তাহলে যার সঙ্গে আপনি কথা বললেন ও কে ছিল?

আমি বললাম, আপনি কোনদিন হেরম্যানকে দেখেছেন? ম্যাকার্থী বলল, হ্যাঁ...কেন?

–ওর ফটোগ্রাফ আপনার কাছে আছে?

না...ওতো আমেরিকান নাগরিক। ওর ফটো আমরা কেন রাখতে যাবো?

–আপনি দয়া করে বলুন...ওকে দেখতে কেমন ছিল?

–রোগা, পাতলা, বেশ চোখা চেহারা, বালি রং-এর চুল, ম্যাকার্থী খুব চটপট জবাব দিল।

–যে রকম বিবরণ দিচ্ছেন, তাতে যে লোকটা নিজেকে বেলিং বলে পরিচয় দিয়েছে, তার সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে।

ম্যাকার্থী কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর গভীর ভাবে বলল, জেফারসন মারা গেছে। পথ দুর্ঘটনায় ওর মৃত্যু হয় এবং ওর মৃতদেহ আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমি বলছি, জেফারসন বেঁচে আছে। অন্ততঃ দু-ঘন্টা আগেও ও বেঁচে ছিল, আপনার বর্ণনার সঙ্গে ওর চেহারা বহু মিলে যাচ্ছে। আমি বেশ জোরের সঙ্গে বললাম।

কিন্তু...মোটর গাড়িতে যে দেহটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা তো জেফারসনের সঙ্গে মিলে...অবশ্য দেহটা যেভাবে পুড়ে গিয়েছিল তাতে বোঝা মুশকিল ছিল। কিন্তু ওর স্ত্রী ওর আংটি আর সিগারেট কেস দেখে ওকে সনাক্ত করে। আমি কিন্তু এখনও বিশ্বাস না করার কোন কারণ দেখছি না যে ওই জেফারসন ছিল।

–ঠিক আছে, আমি যে লোকটার সঙ্গে কথা বলেছি, ধরলাম ও যদি জেফারসন না হয়, তবে ও কে ছিল? আমি প্রশ্ন করলাম।

–আমাকে জিজ্ঞেস করছেন? আমি তো বলেছি জেফারসন যে বেঁচে আছে, এমন ধারণা। করার কোন কারণ এখনও পর্যন্ত দেখছিনা।

আপনি বললেন রোগা, লম্বা, বালি রং-এর চুল...আমি বললাম। তারপর একটু চিন্তা করে বললাম, ডান হাতের একটা আঙুল একটু বাঁকা ছিল, হয়ত কখনও ভেঙে গিয়েছিল, ঠিকমত সে করা হয়নি, তাই...।

–ঠিক, ঠিক, এই জেফারসন–হ্যামিশ বলল। আমি অফিসে আসার পর ওকে এই প্রথম কথা বলতে শুনলাম।ও বলল,ঐবাঁকা আঙুলের কথা আমার মনে পড়েছে, ও নিশ্চয়ই জেফারসন।

ম্যাকার্থী ওর পাইপে গভীর একটা টান দিল।

–তাহলে কার ডেডবডি কবর দেওয়া হল? খুব অস্বস্তিভরে বলল, কার বডি আমেরিকা পাঠানো হল?

–আমার ধারণা ফ্রাংক বেলিং-এর বডি পাঠানো হয়েছে। আমি বললাম, কোন বিশেষ কারণে জেফারসন নিজেকে ফ্রাংক বেলিং বলে আমাকে ধোঁকা দিতে চেয়েছিল।

–কিন্তু, কেন সে তা করবে?

-সেটা আমি বলতে পারছি না। মাথায় হাত বোলাতে গিয়ে যন্ত্রণাটা চাড়া দিয়ে উঠল। উঃ বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। ঠিক আছে। চীফ ইন্সপেক্টর, আমি উঠছি, আমার এখনই বিছানায় যাওয়া দরকার। আমার মাথায় মনে হচ্ছে বেড়ালে আঁচড়াচ্ছে।

–আচ্ছা। আপনি আগে ওয়ং-এর একটু বিবরণ দিন।

-ঐ একই রকম; আর সবচীনারা যেমন দেখতে হয়। আঁটসাট, ঠোঁটে ভারী চেহারা, সোনা বাঁধানো দাঁত।

–হুঁ, ঠিক আছে। আমরা যেমন.ওদের সবাইকে এরকম দেখি, ওরাও তেমনি আমাদের সবাইকে এরকম দেখে।

তারপর হ্যামিশকে বলল, যত লোক লাগে নিয়ে ওর ডেরায় গিয়ে ওকে তন্নতন্ন করে খোঁজ, পাওয়া যাবে বলে তো মনে হয় না, তবু প্রাণপণ চেষ্টা চালাও। আমাকে বলল, মিঃ রায়ান, আপনি আমাদের ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে বিছানায় যান।

আমি ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে হ্যামিশের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

ঐ আড্ডায় জেফারসনকে খোঁজা আর একটা অশরীরীকে খোঁজা একই ব্যাপার। ওখানে কিছু বোঝা যায় না, হয়ত দেখব জেফারসন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আমি জানতেই পারব না। হ্যামিশ, তেতো গলায় বলল।

–আরে ভাই লড়ে যান না। কিছু তো পেয়েও যেতে পারেন।

বুঝলাম, হ্যামিশ আমাকে মনে মনে বেশ কিছু গালি দিল। যাই হোক, ওকে বিদায় জানিয়ে আমি এসে উঠলাম আমার প্যাকার্ড গাড়িটায়। চলে এলাম রিপালস্ বে-তে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত অবস্থা আমার।

লিফট চালিয়ে পাঁচতলায় এলাম। ঘরের দিকে এগোতে এগোতে নাইট বয়টাকে দেখতে পেলাম। মৃদু হেসে আমাকে ঘরের চাবি দিল। আমি ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বসার ঘরে এসে জ্যাকেটটা খুলে ফেললাম। এয়ার কন্ডিশনটা চালিয়ে একটু আরাম বোধ করলাম। এই হোটেলে বসার ঘর আর শোবার ঘরের মাঝখানে একটা পর্দার ব্যবধান আছে। হোটেলের সব ঘরেই এই ব্যবস্থা। পর্দা সরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি আলো জ্বলছে।

একটা মেয়ে আমার বিছানায় শুয়ে আছে। মেয়েটা স্টেলা এনরাইট। সোনালী আর কালো রং-এর ককটেল ড্রেস পরা, বিছানার পাশে ওর দামী জুতো পড়ে রয়েছে।

প্রথমে ওকে দেখে আমি চমকে গিয়েছিলাম কারণ আমার মনে হয়েছিল ও মারা গেছে। তারপর ভাল করে লক্ষ্য করতে দেখি, না, ওর বুক ওঠানামা করছে। ওর দিকে তাকিয়ে দুটো জিনিষ ভেবে অবাক হলাম, এক, ও এখানে কি করছে? দুই,আমার ঘরে ঢুকল কী করে? পরক্ষণেই মনে পড়ল হাসি মাখানো মুখের নাইট-বয়টাকে, স্টেলা নিশ্চয়ই ওকে পয়সা দিয়ে ম্যানেজ করেছে।

অল্পক্ষণ পরেই ও চোখ মেলে তাকালো আর পা দুটো ঝুলিয়ে উঠে বসল।

–আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিঃ রায়ান,–স্টেলা হেসে বলল। ঘুমিয়ে পড়ব বলে ভাবিনি আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি দুঃখিত।

আপনি কি অনেকক্ষণ ধরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন? কিছুবলতে হয়, তাই বললাম। দেখলাম ও উঠে জুতো পড়ল, হাত দিয়ে চুল ঠিক করে বসার ঘরে এলো।

–আমি এখানে সেই দশটা থেকে বসে। আপনার জন্যে আমার চিন্তা হচ্ছিল। আশা করি আপনার এখানে এসেছি বলে কিছু মনে করবেন না। স্টেলা হেসে বলল।

আমি কিছু বলার আগেই ও আবার তাড়াতাড়ি বলল, আপনার কী হয়েছিল? আমি তো প্রায় ফেরিটা মিস্ করে ফেলেছিলাম আরকি। আপনি আমার জন্যে অপেক্ষা করলেন না কেন?

–আমার একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, আমি বললাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই চীনা দুটোর, একটার হাঁতে রাইফেল আর একটার সঙ্গে ছুরির কথা মনে পড়ল।

-এখন আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। সিলভার মাইন উপসাগরে যাওয়ার প্রোগ্রামটা কি আপনি ঠিক করেছিলেন?

ও আমার সামনে একটা চেয়ারে এসে বসল। চোখ, মুখে ভাবখানা যেন কিছুই বুঝছে না।

–আমিই প্রোগ্রামটা করেছিলাম...। আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি না।

না বোঝার মত কোন শক্ত ব্যাপার এটা নয়। আপনিই আমাকে বলে জলপ্রপাতটা দেখতে পাঠালেন। এটা কি আপনিই ঠিক করেছিলেন? নাকি অন্য কারোর পরামর্শে আমাকে এটা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন? আমি কঠিনভাবে বললাম।

স্টেলা চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কেন এই প্রশ্ন করছেন। প্রোগ্রামটা আমার দাদা করেছিল। আমার দাদাই বলেছিল আপনাকে ওখানে আমন্ত্রণ জানাতে। ও আরও বলেছিল আপনি একা থাকেন, সুতরাং আপনাকে সঙ্গ দিলে আপনার ভালই লাগবে।

-উনি কি সত্যিই আপনার দাদা?

একথা শুনে স্টেলার চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল। আমার দিকে একবার তাকিয়েই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ও কিছু বলল না দেখে প্রশ্নটা আবার করলাম।

–আপনি...এমন একটা প্রশ্ন করছেন যে...আমার দিকে না তাকিয়েই ও বলল, আপনি এরকম প্রশ্ন করছেন কেন?

তার কারণ আপনাদের দুজনের মধ্যে কোন মিল নেই। আমি বললাম, আমি ভেবে পাচ্ছি না যে আপনার মতো একটা মেয়ে দাদার সঙ্গে থাকতে চাইবে কেন?

আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে কি যেন ভেবে বলল, না ও আমার দাদা নয়। আমার সঙ্গে ওর পরিচয় গত কয়েক মাসের। এখন মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় না হলেই বোধহয় ভাল হত।

আমি আমার প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করে ওকে একটা দিলাম আর নিজে একটা ধরালাম। চেয়ারে হেলান দিয়ে বেশ আরাম করেবসেও একটা বড় টান দিল। আমি আমার শোবার। ইচ্ছে ত্যাগ করলাম।

–আপনার সঙ্গে ওর আলাপ হয় কোথায়? আমি প্রশ্ন করলাম।

সিঙ্গাপুরে। আমি ওখানে একটা নাইট ক্লাবেক্যাবারেনাচতাম, নিউইয়র্ক থেকে কাজ করতে করতে ওখানে যাই। হঠাৎ একদিন ঐনাইট ক্লাবে পুলিস হানা দিল আর আমি টাকা-পয়সা কিছুই পেলাম না। একেবারে অকূলে ভাসলাম। ও চোখ বুজে বলে যেতে লাগল। এমন বিপদের দিনে আমি হ্যারিকে পেলাম। ও কয়েকবার ঐ ক্লাবে আমার নাচ দেখেছে। ও আমাকে ওর সঙ্গে থাকার প্রস্তাব দিল। ওর টাকাপয়সা এবং অন্যান্য আকর্ষণে ওর প্রস্তাবে আমি রাজি হয়ে গেলাম। তখন থেকে আমরা একসঙ্গে থাকতে লাগলাম। ম্যাকরিটি রিজার্ভয়ের পাশে ওরবাংলোটা ছিল ছিমছাম সুন্দর। আমরা ওখানে বেশ ভালই ছিলাম। তা হলেও আমি দেশে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। ও একবার চোখ খুলে সিগারেটটা দেখে নিল। কিন্তু হ্যারি আমাকে যাওয়ার ভাড়া দিল না। এমন সময় হঠাৎ ও এখানে মানে হংকং-এ চলে এল। আমার জন্যে একটা জাল পাসপোর্ট যোগাড় করল। আমরা সেই থেকে ভাই-বোন এই পরিচয়ে বসবাস করতে লাগলাম। আমার

দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু আমি এখনও বাড়ি ফিরে যেতে চাই। আপনি আমাকে টাকাটা ধার দেবেন? কথা দিচ্ছি কয়েকমাসের মধ্যে শোধ করে দেব।

–হ্যারি ফল পাসপোর্ট কিভাবে জোগাড় করল?

ও মাথা নাড়ল। বলল, সে সব আমি জানি না। আপনি আমাকে টাকাটা ধার দেবেন কিনা বলুন।

–আমি এভাবে টাকা ধার দিইনা।

–ঠিক আছে, আমার ওপর আপনার ভরসার অভাব থাকলে আমরা একসঙ্গে ফিরব, বলে ও হাসল। কেন যেন মনে হল ও ভয় পেয়েছে। ওর চোখ-মুখে সেইরকম একটা ভাব। তারপর আবারও বলল, আর আমি... এই টাকার উপযুক্ত দাম দেবার চেষ্টা করব। আমি কি বলতে চাইছি, আশা করি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই।

–এখন আমি একটু ড্রিঙ্ক করব। আমি বললাম। আপনার জন্যে কিছু বলব? আমি প্রশ্ন করলাম।

ও চেয়ারে তাড়াতাড়ি খাড়া হয়ে বসে চোখ বড় বড় করে বলল, না, না, এ ঘরে কাউকে আসতে দেবেন না। আমি চাই না কেউ জানুক আমি এ ঘরে আছি।

নাইট বয়টা জানে, ওই তো আপনাকে এ-ঘরে ঢুকতে দিয়েছে, তাই না?

না। আমি আপনার ঘরের নম্বর জেনে বোর্ড থেকে চাবি নিয়ে এসেছি। দুটো চাবি ছিল, ও জানে না আমি এখানে আছি।

আমি আমার মাথার যন্ত্রণা ভুলে গেলাম।

আমি বললাম, আপনি কেমন একটা ভয় পাচ্ছেন, যেন?

চেয়ারে ও আরাম করে বসে আমার দিকে চেয়ে বলল, কই, নাতো, আমি ভয় পাচ্ছিনা। আমি এখান থেকে দূরে চলে যেতে চাইছি। আমার বাড়ির জন্যে ভীষণ মন খারাপ করছে।

হঠাৎ এখনই আপনি বাড়ির জন্যে এত উতলা হচ্ছেন কেন?

–আপনি এত প্রশ্ন করবেন না আপনি আমায় টাকাটা দেবেন? আপনি যদি টাকাটা দেবেন বলে কথা দেন, তাহলে এখনই আপনার সঙ্গে সোব। স্টেলা বলল।

টাকাটা আমি আপনাকে দেব, যদি আপনি হ্যারি এনরাইটের সম্বন্ধে আমাকে সব জানান।

একটু ইতস্ততঃ করে ও বলল, আমি ওর সম্বন্ধে বেশি কিছুই জানি না। সত্যি বলছি, ও খুব ফুর্তিবাজ...হৈ চৈ করে থাকার লোক।

আমার পক্ষে ধৈর্য ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, ঠিক আছে আপনি যদি এনরাইটের সম্বন্ধে এটুকুই জানেন, তাহলে আপনাকে টাকা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমি টেলিফোনের দিকে যেতে যেতে বললাম, আমি এখন ড্রিংক অর্ডার দিচ্ছি। সেটা খেয়ে আমি বিছানায় যাবো এবং একা। সুতরাং ওয়েটার আসার আগে আপনি ঘর ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

না, দাঁড়ান। স্টেলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

আমি টেলিফোনে একবোতল স্কচ আর বরফ আমার ঘরে দিয়ে যেতে বললাম।

আমি রিসিভার রাখতেইও বলে উঠল, আমি হ্যারি সম্বন্ধে যা জানি বললে, আপনি সত্যিই আমাকে টাকাটা দেবেন?

–হ্যাঁ, সেইরকমই বলেছিলাম। আমি বললাম।

–আমার মনে হয় ও একজন মাদক দ্রব্যের স্মাগলার। ও খুব অস্বস্তির সঙ্গে হাত কচলাতে কচলাতে বলল।

-আপনার এরকম মনে হল কেন?

–লোকজন ওর সঙ্গে রাত্রে দেখা করতে আসে। সিঙ্গাপুরে থাকার সময়ও দেখেছি। ও প্রায়ই ডকে গিয়ে খালাসীদের সঙ্গে দেখা করত। পুলিসের সন্দেহ হওয়ায় আমাদের বাংলোতে রেইড করেছিল, যদিও তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পায়নি। যাই হোক, এখানেও লোকজন আসে রাত্রে এবং তারা সকলেই চীনা।

–আপনারা আসার আগে জেফারসন ঐ বাংলোতে থাকতো?

-হ্যাঁ। আমাকে হ্যারি একথা কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছিল। জেফারসন মারা গেলে হ্যারিকে ওর জায়গায় সিঙ্গাপুর থেকে আনা হয়। মাদক দ্রব্য আনা এবং পাচারের জন্য আমাদের বাংলোটা উপযুক্ত জায়গা।

দরজায় মৃদু একটা টোকা পড়লা

–ওয়েটার এসে গেছে, আমি বললাম। আপনি বাথরুমে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

স্টেলা বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করার পর আমি গিয়ে দরজা খুললাম।

দরজার বাইরেই হাসি হাসি মুখে হ্যারি এনরাইট দাঁড়িয়ে। ওর হাতে একটা পয়েন্ট থ্রী এইট অটোমেটিক রিভলভার আমার দিকে তাক করা।

নড়ার চেষ্টা করনা, টিকটিকি। ও বলল, হাত দুটো তুলে দাঁড়াও। ঘরে ঢোক।

আমি হাত তুলে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

–কোন হৈ-চৈ করার চেষ্টা কর না। ওয়েটারকে বলেছি তুমি মত বদল করেছ। কাজেই ও আর এখন আসবে না। দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে হ্যারি বলল।

–ঠিক আছে, বসতে পারিতো? আমি বললাম উত্তেজনাটা আমার পক্ষে একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে।

আমি বসে হ্যারিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। ওর মুখে স্থির হাসি, চোখের দৃষ্টি ঠাণ্ডা এবং ভয় জাগানো। আমি সতর্ক হলাম। রিভালভারটা শক্ত হাতে ধরা আর তাক করা আমার দু-চোখের মাঝখানটায়।

এনরাইট বলল, তুমি বেশ স্মার্ট এবং একটু বেশিই স্মার্ট। গত তিন সপ্তাহ ধরে আমি যা খুঁজছি সেটা তুমি আমার আগেই পেয়ে গেন্ত্রে?

–কি সেটা? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

–তুমি জেফারসনকে খুঁজে বের করেছা ঐ কুত্তার বাচ্চাটাকে আমি কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারছিলাম না। শেষে তোমার ওপর নজর রাখতে রাখতে ওর খোঁজ পেলাম। উঃ! আমি, ওর জন্যে পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম।

যাই হোক আমি তো তোমাদের পেছনে লাগিনি। তুমি দয়া করে পিলটা সরাবে? আজ সারাটা দিন আমার খুৰ খাটুনী গেছে, এরপর ওটার ধকল...। হ্যারি তবুও পিস্তল না সরিয়ে ঘরের ভেতরে একটা চেয়ারে এসে বল যে চেয়ারটায় কয়েক মিনিট আগে স্টেলা বসেছিল।

-পিতলের জন্যে কিছু চিন্তা কোরনা। উল্টো-পাল্টা কিছুনা করলে পিস্তলও তোমার সঙ্গে অভদ্রতা করবে না। এখন বল, পুলিসকে তুমি কী বলেছে? হ্যারি প্রশ্ন করল।

–পুলিসকে আমি কিছু বলেছি এটা তুমি ভাবছে কেন? আমি বললাম।

–যে মুহূর্তে তুমি পেডালে নিয়ে আমার ভিলার সামনে ঘুরতে ঘুরতে আগ্রহ দেখিয়েছিলে, সেই মুহূর্তে থেকে আমাদের লোকেরা তোমার ওপর থেকে চোখ সরায়নি। হ্যারি বলল।

–আমাদের লোকেরা মানে তোমাদের ঐ মাদকদ্রব্য চালানকারী লোকেরা?

— হ্যাঁ। এটা খুব বড় ব্যাপার...তোমার পক্ষে তো খুবই বড়। আমি ভেবেছিলাম লোক দুটো তোমাকে ঘাবড়ে দিয়েছে। অবশ্য দিলে ভাল হত না। তুমি যে জেফারসনুকে খুঁজে বেড়াচ্ছো সেটা আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি।

না, জেফারসনকে আমি খুঁজছিলাম না...আমি ভেবেছিলাম ও সত্যি সত্যিই মারা গেছে। আমি বললাম।

আমরাও তাই ভেবেছিলাম। হারামীটা আমাদের ধোঁকা দিয়েছে। আমরা বেলিংকে খুঁজছিলাম। তারপর তোমার পিছু নিয়ে আমরা জেফারসনকে পেয়ে গেলাম।

আমি ভাবছিলাম স্টেলা বাথরুমে এখন কি করছে। ওর দিকে চেয়ে বললাম, তাহলে তোমরা ওকে পেয়ে গেছ?

ক্রুর হেসে হ্যারি জবাব দিল, হ্যাঁ, আমরা ওয়ং-কেও পেয়েছি।

ওয়ং কে? আমি প্রশ্ন করলাম।

–ওয়ং আমাদের দলের একজন দলছুট চামচা ও ব্যাটা জেফারসনের চামচাগিরি করছিল। ঠিক এই মুহূর্তে ওদের আচ্ছা করে দলাই-মলাই করা হচ্ছে। তারপর ওদের শরীরের অবশিষ্ট সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে।

-ওরা তোমার কী করেছে?

দলছুটদের আমরা এইভাবেই শাস্তি দিই। এনরাইট বলল, এবং তুমি সেটা ভেবেই বল, পুলিসকে তুমি কি বলেছে?

ওরা যা জানে, তার থেকে নতুন কিছুই না। আমি বললাম।

আমার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে ও উঠে দাঁড়াল।

-ঠিক আছে চল আমরা কিছুটা হেঁটে গাড়িতে উঠব। তুমি যদি পালাবার চেষ্টা কর, জেনে রাখবে সেটাই তোমার শেষ চেষ্টা। আমার চারজন লোক বাইরে অপেক্ষা করছে। ওদের প্রত্যেকের কাছে ছোরা আছে। ওরা চল্লিশ গজ দূর থেকেও তোক খুন করতে পারে। আর তোমার মৃত্যুর খবর কেউ পাওয়ার আগেই ওরা কয়েক শো মাইল দূরে চলে যেতে পারে। এটা মনে রেখে চুপচাপ এগোও।

–চুপচাপ হেঁটে গাড়ির দিকে চললাম।

তারপর কোথায় যাব? প্রশ্ন করতে এনরাইট মিচকে হেসে বলল, এখনই এত চিন্তা করার কি আছে, চল দেখতেই পাবে। এস।

দরজার সামনে গিয়ে দরজা খুলে একপাশে দাঁড়িয়ে হ্যারি বলল, নাইট বয় তোমাকে কোন সাহায্য করবেনা। ও আমার হয়ে কাজ করছে। কাজেই বোকার মত কিছু কোর না। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামব। ওখানেও চারিদিকে আমার লোকেরা রয়েছে। বেঁচে থাকতে চাইলে ভালমানুষের মত এগিয়ে চল।

প্যাসেজে বেরিয়ে এলাম। এনরাইট ওর পিস্তল পকেটে ভরে নিয়েছে, কিন্তু হাতে ধরা। আমরা কয়েক পা এগিয়ে সিঁড়ির মুখে এলাম।

এনরাইট বলল, সিঁড়ি দিয়ে নাম, আমি তোমার পেছনে আছি।

চারধাপ সিঁড়ি ভেঙে নীচে লবিতে এসে দেখলাম লবি একবারে ফাঁকা।লাউঞ্জিং চেয়ারে দুজন বসে, তার মধ্যে একজন সার্জেন্ট হ্যামিশ অন্যজনকে আমি আগে দেখিনি। ওদের দেখেই আমি ইচ্ছে করে কার্পেটে পা জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়লাম। সেই মুহূর্তে পেছনে একটা রিভলভার গর্জে উঠল। পর মুহূর্তেই বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটার শব্দের সঙ্গে শুনতে পেলাম, আমার ওপর দিয়ে এক ঝাক গুলি পেছন দিকে চলে গেল। আমি মরার মতো শুয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে জুতোর আওয়াজে চমক ভাঙল।

–উঠে পড়ুন। হ্যামিশ বলল। একটু গড়িয়ে গিয়ে চিৎ হলাম. মাথাটায় কেমন ঘোর লেগে আছে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম।

দেখলাম, আমার ঠিক পেছনেই এনরাইট চিৎহয়ে পড়ে আছে।বুলেটে মুখটা ক্ষত-বিক্ষত। রক্ত বেরিয়ে গড়িয়ে গেছে। জ্যাকেট দিয়ে তখনও অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলাম ও মারা গেছে।

-ওকে মেরে ফেলতে হল? হ্যামিশকে বললাম।

না মারলে ও আপনাকে মারত, নিরাসক্তভাবে জবাব দিল। হয়তো আমাকেও মেরে ফেলত।

–এদের দলের আরও কয়েকজন এখানে আছে, আর পাঁচতলার নাইট বয়ও এদের দলের লোক। আমি বললাম।

অন্য পুলিসটা লিফটের দিকে এগোতেই হ্যামিশ বলল, আর সবাইকে ধরার ব্যবস্থা আমি আগেই করেছি। আমাদের টেলিফোন করল মেয়েটা কে?

আমি ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

–একটা মেয়ে ফোন করেছিল? আমি প্রশ্ন করলাম।

–হ্যাঁ, তা না হলে আমরা কী করে জানব এখানে কি হতে চলেছে। একটু উত্তেজিত হয়ে হ্যামিশ আবার জানতে চাইলো, একটা মেয়ে ফোন করেছিল, মেয়েটা কে?

-ঠিক বলতে পারব না। কেউ একজন হবে হয়ত।

–প্রায় আধ ডজন চীনা পুলিস লবিতে নেমে এল। হ্যামিশ ওদের সঙ্গে কথা বলে আমার দিকে তাকাল।

চলুন, হ্যামিশ আমাকে বলল, আপনাকে সব ঘটনা চীফ ইন্সপেক্টরকে বলতে হবে।

চীনা পুলিসগুলো এনরাইটের মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিসের জীপে গিয়ে উঠলাম।

.

৩.৪

পুলিস হেডকোয়ার্টারে এসে একটা ঘরে আমি ঘণ্টা তিনেক আটকে রইলাম। ঘরটায় একটা কোচ ছিল, আমি সেটায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোর চারটে নাগাদ ঠেলা খেয়ে ঘুম ভাঙল, দেখি হ্যামিশ, ওকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

–আসুন। ও বলল।

ওঠার সময় মাথার যন্ত্রণাটা টের পেলাম। ঝাঁকিয়ে উঠলাম, বললাম, কী হবে এখন?

চীফ আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে প্রস্তুত। তাছাড়া আপনি একাই বা ঘুমোবেন কেন? হ্যামিশ বলল।

ম্যাকার্থী ঘরে বসে বসে পাইপ টানছে। হাতের কাছে এক কাপ চা। একটা পুলিস অফিসার আমাকেও এককাপ চা দিয়ে গেল। আমি একটা চেয়ারে বসলাম। ম্যাকার্থী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে লাগল।

জল পুলিস একজনকে ধরেছে, সে এনরাইটের স্পীডবোট নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ম্যাকার্থী বলল। অনেক ঝামেলার পর, শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে।

–লোকটা কি আমেরিকান?

না, না-চীনা ক্যান্টনের লোক। আপনি যেহেতু জেফারসনের কেসটা দেখছেন, আপনাকে এটা জানিয়ে রাখা ভাল।

ধন্যবাদ, জেফারসনকে কি পাওয়া গেছে?

আধঘণ্টা আগে ওর মৃতদেহ উপসাগরে পাওয়া গেছে। ম্যাকার্থী আমাকে জানালো।

ম্যাকার্থী আবার ক্লিষ্ট হেসে বলল, আমার মনে হয় ও প্রথমবারে মারা গেলেই ভাল হতো। কারণ মেরে ফেলার আগে ওর ওপর প্রচণ্ড দৈহিক অত্যাচার হয়েছে। ব্যাপারটা আমার কাছে এখন অনেকটা পরিষ্কার। কী রকম বলছি, জেফারসন এখানে আসার পর থেকে জো-অ্যানের অসামাজিক উপায়ে রোজগারের পয়সায় দিন কাটাত। মেয়েটাকে ও বিয়ে করেছিল হয়ত ওর মুখ বন্ধ করার জন্যে। যাই হোক, ফ্রাংক বেলিং এর সঙ্গে সাক্ষাতের কয়েক সপ্তাহ পরে ও জো অ্যানকে বিয়ে করে।

বেলিং মাদক চালানের এক নম্বর পাণ্ডা। ও রিপালস্ বের ভিলাটা লিম-ফানের কাছ থেকে ভাড়া নেয়, কিন্তু কী কাজের জন্যে ভিলাটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা লিন-ফান হয়ত জানত না। তবে এ ব্যাপারে আমি খোঁজ নিচ্ছি। ভিলাটার একটা ঘাটে, একটা স্পীডবোট রয়েছে, জায়গাটা নির্জন,সুতরাং ঐ ভিলাটা মাল চালান নেওয়ার পক্ষে খুবই আদর্শ স্থান। কিন্তু জায়গাটা কিছুদিনের মধ্যে বেলিং-এর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। আমরা ওকে অ্যারেস্ট করার সমস্ত ব্যবস্থা নিতে লাগলাম। এটা জানতে পেরে ও ঠিক করল ও ক্যান্টনে পালিয়ে যাবে। আর ব্যাপারটা একটু ঠাণ্ডা হলে ফিরে আসবে।

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ভিলাতে মাল এনে সেটা নেবার জন্যে জেফারসনকে ও বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক করল। তা ওখানে গিয়ে জেফারসন বেশ আরামেই রইল যার জন্যে জো অ্যানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজন হল মা। বেলিং ক্যান্টনে গিয়ে দু-হাজার আউন্স হেরোইন পাঠাবার ব্যবস্থা করল। একদিন রাত্রে বেলিং এসে জেফারসনকে বোঝাল মালটা কিভাবে দিতে হবে।

জেফারসন ভাবছিল এই মালটা যদি ও হাত সাফাই করতে পারে তাহলে তার ভাগ্য ফিরে যাবে। কিন্তু পালাবে কি করে! ওদের সংগঠন যে বেশ শক্তিশালী সেটা ও জানত। যাই হোক, বলা যায় ভাগ্য ওর সহায় ছিল। হেরোইন এল, সেটা ভিলাতে মজুত করা হল। তারপর বেলিং আর জেফারসন গাড়ি নিয়ে লেকিপাস-এর দিকে চলল।ওখান থেকে ক্যান্টনে কেটে পড়া সোজা। কিন্তু পথ দুর্ঘটনায় বেলিং মারা গেল। জেফারসন চালাকি করে নিজের আংটি আর সিগারেট কেস ওর পকেটে ঢুকিয়ে গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। দুর্ঘটনাটা ভোরবেলা একটা নির্জন এলাকায় ঘটেছিল বলে জেফারসনের কোন অসুবিধা হয়নি। একটা সাইকেল চুরি করে ভিলায় ফিরে এসে হেরোইনটা সরিয়ে

সম্ভবতঃ সেলেশিয়াল এম্পায়ার হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল। খানিকটা অনুমান করে বলছি যে, ওখানে ও জো-অ্যানকে বুঝিয়ে অথবা ভয় দেখিয়ে বেলিং-এর মৃতদেহ সনাক্ত করতে বলে। তারপর ও কউলুনের দেওয়াল ঘেরা শহরে আশ্রয় নেয়।

–ও এটা করল কেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

–আসলে কাজটা ঝোঁকের মাথায় খুব তড়িঘড়ি করে করেছে। একটা সুযোগ নিতে গিয়ে বুঝল, ও ফেঁসে গেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ওরা দলের লোকেরা হেরোইনের খোঁজে ভিলায় গিয়ে দেখে সেটা হাওয়া হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই ওর বেলিংকে সন্দেহ করে ও ওর খোঁজে নেমে পড়ে। জেফারসনের সৌভাগ্য যতক্ষণ পর্যন্ত দলের লোকেরা বেলিং-এর পিছনে ছুটবে, ততক্ষণ ওর রাস্তা পরিষ্কার। কিন্তু ওকে হংকং থেকে পালাতে হবে। দেখা গেল, সেটা ওর পক্ষে অসম্ভব। ধরে নেওয়া হয়েছে ও মারা গেছে, কাজেই একটা জাল পাসপোর্ট-এর ব্যবস্থাও করতে পারেনি। কাজেই ও নিজের ফাঁদে আটকা পড়েছিল!

–হেরোইনটা কী হল?

ম্যাকার্থী চোখ কোঁচকালো।

–আমার মনে হয়না ওটা আমরা পাব বলে। জেফারসনের বডি দেখে আমরা নিশ্চিন্ত যে ওকে মেরে ফেলার আগে ওর ওপর প্রচুর অত্যাচার করা হয়েছে এবং ওরা জেনে নিয়েছে হেরোইনটা কোথায় লুকোনো আছে। ম্যাকার্থী বলল।

কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার সন্দেহ হচ্ছে জো-আন কেন বেলিং-এর দেহ জেফারসনের বাবার কাছে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলাটা নিল। আমি বললাম।

–ওর হংকং থেকে চলে আসার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পয়সা কড়ি ছিলনা।বডিটা আনার মওকায় ও শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা পেয়েছিল। ম্যাকার্থী বলল।

–হু...এটা হতে পারে। আচ্ছা ওয়ং কে?

–সেও ওদের দলের লোক। তবে জেফারসন্দ্রে সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে ভুল করেছে।

এয়ারপোর্টে ওয়ং আমাকে পাকড়াও করে। আচ্ছা আমি যে আসছি, ও জানল কী করে? ও খবরটা পেল কার কাছ থেকে? ওকে যখন আমি, দো-ভাষী নিয়োগ করলাম ও আমাকে তাড়াতাড়ি কউলুন থেকে কাটিয়ে দিল। অবশ্য ও চাইছিল আমি যাতে জেফারসনের থেকে দূরে থাকি। লেইলার সঙ্গে দেখা না হলে আমি এনরাইটের কোন খোঁজই পেতাম না।

–মিঃ জেফারসন কি ওর ছেলের বডি ফেরৎ চাইবেন? ম্যাকার্থী জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, তাইতো মনে হয়। আমি আমেরিকান কনস্যুলেট-এ মিঃ উইলকক্স-এর সঙ্গে দেখা করে সব কাগজ পত্রের ব্যবস্থা করে রাখব। ওয়ং-এর বডি পাওয়া গেছে?

–এখনও জলে খোঁজ হচ্ছে। যে চীনাটাকে আমরা ধরেছি সে বলেছে দুটো দেহই এক জায়গায় ফেলা হয়েছে।

আমি সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম।

ম্যাকার্থী পাইপ দিয়ে নিজের নাকটা ঘষতে ঘষতে বলল, হ্যাঁ, একটা কথা, আপনি বোধহয় জানেন না সিলভার মাইন উপসাগরীয় অঞ্চলে একটা চীনার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। মাথার ঠিক মাঝখানে কেউ লী এনফিল্ড রাইফেল দিয়ে গুলি করেছে, আপনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন?

-তাই নাকি? আর্মির চাকরি ছাড়ার পর থেকে আমি লী এনফিল্ড-এ হাত দিইনি।

–আমি বলছি না গুলিটা আপনি ওকে করেছেন। আপনি তো কাল বিকেলে ওখানে গিয়েছিলেন?

-হা গিয়েছিলাম ওখানকার জলপ্রপাতটা দেখতে।

–ঠিক ওখানেই বডিটা পাওয়া গেছে।

–হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে?

–আপনি কোন গুলির আওয়াজ পাননি?

না।

ম্যাকার্থী একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, অবশ্য আমি জানতাম যে আপনি জানতে পারলে নিশ্চয়ই আমাকে জানাতেন।

–ঠিক বলেছেন।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর আবার ওর পাইপ ভরতে ভরতে ম্যাকার্থী বলল, এনরাইটের একটা বোন ছিল।.বেশ সুন্দরী, আপনি জানেন ও কোথায়?

আমি বললাম, হয়তো ওদের ভিলাতে ঘুমুচ্ছে, যেটা এই মুহূর্তে আমার ভীষণ দরকার।

-ওখানে নেই...আমরা খোঁজ নিয়েছি। আপনি ওকে শেষ কোথায় দেখেন?

–ফেরি বোটে-সিলভার মাইনে যাবার সময়। যে মেয়েটি আগে ওদের বাড়ি কাজ করত তার জন্যে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা এক বোটেই ছিলাম।

-তারপরে ওকে দেখেন নি?

না

–আমাদের ধারণা, ঐ মেয়েটিই আমাদের ফোন করেছিল এবং সেটা আপনার ঘর থেকে।

হতে পারে। ওর স্বভাব খুব ভাল। আমি বললাম।

ম্যাকার্থী হঠাৎ হেসে উঠে বলল, ঠিকই ধরেছেন মিঃ রায়ান। আমরা ওর সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ওর নাম স্টেলা মে টাইসন। সিঙ্গাপুরে এক নাইট ক্লাবের নর্তকী ছিল।

ঘটনাচক্রে এনরাইটের সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর একটা জাল পাসপোর্ট বানিয়ে এখানে আসে।

তাই নাকি?

–ও যখন ফোনটা করে তখন আমরা এটা নির্দিষ্ট করি ওটা হোটেল থেকে এসেছে এবং হোটেল থেকে জানতে পারি ওটা আপনার ঘরের বাথরুম থেকে করা হয়েছে। দশটার সময় ওকে আপনার ঘরে যেতে দেখা গেছে এবং এখনও হয়ত ও আপনার ঘরেই আছে।

–থাকতে পারে। ও আমার প্রাণু বাঁচিয়েছে। একটু বিব্রত ভাবে আমি বললাম, কি করে আশা করেন ওকে আপনাদের হাতে তুলে দেব?

–কিন্তু পুলিস অফিসারের কাছে মিথ্যে বলাটাও ঠিক নয়। যাইহোক আপনার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এবং মাদকপাচারকারীদলটি ধরতে সাহায্য করার জন্যে ওকে আমরা ক্ষমা করার কথা চিন্তা করতে পারি। কিন্তু আপনি ওকে বলে দেবেন যেন আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই স্থান ছেড়ে চলে যায়। তারপরেও ও এখানে থাকলে আমরা অন্য ব্যবস্থা নেব।

ধন্যবাদ, ওকে আমি বলে দেব। মিঃ ম্যাকার্থী আমিও এবার চলে যাচ্ছি। এখানে যে কাজে। এসেছিলাম, তা বোধহয় শেষ হয়েছে। এখন আমার কাজ জো-অ্যানকে কে খুন করল খুঁজে বের করা। তবে, সে লোক প্যাসাডোনায় আছে। এখানে যে সব সূত্র পেলাম, তার ভিত্তিতে ওটার সমাধান করা যাবে। তাহলে এখন আমি চলি।

ঠিক আছে। ম্যাকার্থী বলল।

–এখন হোটেলে গিয়ে স্নান করে লম্বা ঘুম দিতে হবে।

–তবে মেয়েটা যদি এখনও আপনার ঘরে থাকে, তাহলে আপনাকে বেশিক্ষণ ঘুমতে দেবে কিনা সন্দেহ আছে। ম্যাকার্থী ফিচেল হাসি হেসে বলল।

–আপনার আন্দাজের তুলনা হয়না। আমার হোটেলে যাবার জন্যে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারেন?

ম্যাকাধী হ্যামিশের দিকে তাকাল।

–একটা গাড়ি করে ওকে তাড়াতাড়ি হোটেলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা কর। ওর একটু বেশিই তাড়া আছে। ও একটা ফাইল টেনে নিল।

হোটেলে যখন পৌঁছলাম তখন মাথার ওপর সূর্যদেব উঁকি মারছেন। করিডোরে অন্য একটা চীনা ছেলে আমাকে চাবি দিল। আমি ঘর খুলে দেখলাম ঘরে আলো জ্বলছে আর স্টেলা একটা আরাম কেদারায় বসে ঝিমোচ্ছে। আমাকে দেখেই ভয়ে তাকাল।

–আরাম করুন, এখন আপনার জয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি বললাম।

–আমি বাইরে গুলির আওয়াজ পেয়ে ভাবলাম ওরা বোধহয় আপনাকে মেরে ফেলেছে।

আমি আর একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লাম আর বললাম,

–আপনার জন্যে খুব জোর বেঁচে গেছি।...ধন্যবাদ।

–প্রথমে খুব ভয় পাচ্ছিলাম, যদি টেলিফোন করার শব্দটা ও পায়।

যাক! আমার ভাগ্য এবং আপনিও শুনুন। আপনাকে এখান থেকে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চলে যেতে হবে। ভাড়ার টাকাটা আমি দেব। পুলিস কোন ঝামেলা করবেনা। আপনি আপনার নিজের পাসপোর্ট ব্যবহার করবেন। ওটা আছে তো?

একটা বড় নিশ্বাস ফেলে স্টেলা বলল, হ্যাঁ আছে। আর হ্যারি?

–ও মারা গেছে। ভালই হয়েছে তা না হলে সারাজীবন জেলে পচতে হতো।

স্টেলা ডুকরে উঠল।

মারা গেছে? উঃ!

–হ্যাঁ, মারা গেছে। আমাকে এখন একটু ঘুমতে হবে। আমি বাথরুমে যাচ্ছি। আপনি আমার বিছানাটায় শুতে পারেন, আমি শোফাটায় শোব।

বাথরুমে স্নান করলাম বেশ ভাল করে। তারপর পাজামা পরে বাইরে এলাম। বেশ ভাল লাগছে। স্টেলা তখনও আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওর সব জামাকাপড় বিছানার

পাশে পড়ে রয়েছে। একটা পাতলা চাদরে ঢাকা ওর শরীর। ও হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরল, বিছানায় শুয়ে আলো নিবিয়ে দিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৪.১

বাঃ! এই তো সেই পরিচিত গন্ধ। ঘাম, জীবাণুনাশকের চেনা গন্ধ। ভারী জুতো পরা লোকজনের চলাফেরার শব্দ।

আমি ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট রেটনিকের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দরজায় টোকা মারলাম।

একজন গম্ভীর গলায় কিছু বলতে হাতল ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

রেটনিক ডেস্কে বসে কাজ করছে, পুলস্কি দেশলাই কাঠি চিবোচ্ছে হেলান দিয়ে।

দুজনেই কপাল কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। রেটনিক টুপীটা পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

নির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ্য না করে কথাগুলো হাওয়ায় ছুঁড়ে দিল। বলল, ভাল একটা চমক পাওয়া গেল। ইস, তুমি এখানে আসবে জানলে তোমার সম্মানে শহরের ব্যান্ডটা বাজানোর ব্যবস্থা করতাম। যাক্, বস। চীনা মেয়েদের কেমন লাগল?

ঠিক বলতে পারব না। কাজের ঠেলায় ওদের দিকে তাকাতে সময় পাইনি। তা আপনার এদিকে খবর কি? খুনের কেসটার কোন হদিশ পেলেন?

রেটনিক ওর চুরুট বের করে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল।

না। এখনও কিছু হয়নি। তুমি কিছু পেয়েছে।

–বোধহয় কিছু পেয়েছি...আপনি কোন হদিশ করতে পারেন নি?

চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ল।

আমরা এখনও হার্ডউইককে ধরার চেষ্টা করছি। তুমি কী কী পেয়েছো?

–জো অ্যান যে মৃতদেহটা এখানে এনেছিল ওটা হেরম্যান জেফারসনের ছিলনা।

ও বেশ ধাক্কা খেল। চুরুটের ধোঁয়া গলায় আটকে বিষম খেল। তারপর রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে আমার মুখের দিকে ছলছলে চোখে তাকাল।

-দেখ টিকটিকি, যদি উল্টোপাল্টা খবর দিয়ে স্মার্ট হবার চেষ্টা কর, তবে আমি তোমায় ছাড়ব না।

–হেরম্যান জেফারসন মাত্র দুদিন আগে খুন হয়েছে। তারপর ওর বডি সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ পুলিস সেটা জল থেকে উদ্ধার করেছে। এই সপ্তাহের শেষে বডিটা প্লেনে এখানে আসছে।

–আশ্চর্য, তবে ঐ কফিনে কার বডি ছিল?

বৃটিশ স্মাগলার ফ্রাংক বেলিং বলে একটা লোকের...আপনি তাকে চিনবেন না।

–তুমি কি বুড়ো জেফারসনের সঙ্গে দেখা করেছ?

না। এখনও করিনি। নোঙর তো প্রথম আপনার এখানেই ফেলতে হয়, তারপর অন্য জায়গায়।

রেটনিক পুলস্কির দিকে তাকাল। পুলস্কি ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো।

তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে রেটনিক বলল, ঠিক আছে, তোমার ওখানকার পুরো ঘটনা আমাকে খুলে বল। দাঁড়াও এক মিনিট আমি সব লিখে নেব। টেলিফোন তুলে স্টেনোগ্রাফারকে ডাকাল, তারপর অপেক্ষা করতে লাগল।

একজন পাতলা চেহারার পুলিস এসে চেয়ারে বসে নোটবুক খুলে একবার রেটনিকের দিকে তাকাল তারপর আমার দিকে।

রেটনিক বলল, আরম্ভ কর। কিন্তু মনে রেখো একটাও যদি মিথ্যে বলেছে তো তোমার জন্মের ঠিক থাকবে না বলে দিচ্ছি। আর কিছু যেন বাদ না পড়ে।

আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। আপনার কাছ থেকে আমি অশ্লীল কথা শুনতে আসিনি। জেফারসন আপনাকে দুরমুশ করার জন্যে তৈরী হয়ে আছে, আমার একটা কথা আপনাদের সকলকে শায়েস্তা করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

পুলস্কি ঘোঁৎ করে এগিয়ে আমাকে মারতে এলো। স্টেনোগ্রাফার পুলিসটাও ক্ষেপে উঠে দাঁড়াল। আমিও শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

রেটনিক দাঁড়িয়ে পুলস্কিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

চুপ। পুলস্কিকে খেঁকিয়ে উঠে বলল, বসো, বসো। এই কথায় এত রেগে যাবে বুঝতে পারিনি। এবার যাক, তোমার স্টেটা ন্ট দাও।

আমি ওর দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। ও আমার দিকে না তাকানোর ভান করল। একটু মাথা ঠাণ্ডা হলে একটা সিগারেট ধরিয়ে হংকং-এর পুরো ঘটনাটা বললাম। শুধু এটা বললাম না যে আমি আর লো নিউইয়র্ক অবধি একসঙ্গে এসেছি। তারপর আলাদা হয়ে যাই, তখন এই বিচ্ছেদের সময় দুজনেরই খুব কষ্ট হচ্ছিল।কিন্তু ও নিজের পরিবেশে চলে এসেছে, সেজন্যে ওর সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখার কোন অর্থ হয়না। ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে এজন্য আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি ওকে আমার নিজের টাকা থেকে দুশ ডলার দিয়েছি যাতে ও নতুন করে কিছু শুরু করতে পারে। ও অশ্রু উগত কণ্ঠে আমাকে বিদায় জানিয়েছে। ব্যস, এই ছিল আমাদের শেষ দেখা।

এই সময়ের মধ্যে রেটনিক দুটো চুরুট শেষ করেছে। স্টেনোকে লেখাটা টাইপ করে আনতে বলল। পুলস্কি-কেও ইশারায় বাইরে যেতে বলল।

–কিন্তু ঐ চীনা মেয়েটা, জো-অ্যান কেন খুন হল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তাই না? রেটনিক বলল।

হু। তাই তো আমিও ভাবছি।

রেটনিক বলল, আমাদের ঐ কফিনটা খুলতে হবে। তবে বুড়ো জেফারসন হয়তো এটা পছন্দ করবেন না।

–কেন করবেন না? কফিনে তো আর ওঁর ছেলের লাশ নেই। আমি বললাম।

–তা নেই...তবে ওদের ফ্যামিলি ভলট খুলতে হবে তো...রেটনিক বাধো বাধো গলায় বলল।

–সেটা চিন্তা করবেন না। সে আমি ব্যবস্থা করব। আমি বললাম।

রেটনিক কেমন হতাশভাবে বলল, খবরের কাগজগুলোরসিয়ে রসিয়ে লেখার মত একটা বিষয় পাবে। ওরা একটা ঝামেলাও পাকাতে পারে।

–তা পারে।

টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বলল, দেখ রায়ান, এই নিয়ে কোন ঝামেলা হোক তা আমি চাই না। আর এজন্য আমি তোমার ওপর অনেকটা নির্ভর করতে পারি। কফিনটা আমাদের একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল।

আমি বললাম, ঠিক আছে মিঃ রেটনিক, আমি চলি। মিঃ জেফারসনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

–আমি তোমার টেলিফোনের আশায় বসে রইলাম। উনি মত দিলেই আমি গিয়ে কফিনটা খুলব।

–ঠিক আছে।

–একটা কথা মনে রেখো, পুলিস কোয়ার্টারে তোমার সত্যিকারের একজন বন্ধু রইল। দরকার পড়লে সব সময়ই সাহায্য পাবে।

বুঝলাম। আপনি আমাকে দেখলে আমিও আপনাকে দেখব, তাহলে দুজনেরই ভাল হবে। তাই না?

গাড়িতে উঠে কিছুক্ষণ গুম মেরে চিন্তা করলাম। আগে অফিসে যাব।

অবশ্য অফিসটা এখনও যদি থেকে থাকে। তারপর ওখান থেকে জেনেৎ ওয়েস্টকে ফোন করে জেনে নেব বিকালে মিঃ জেফারসনের সঙ্গে কথা বলা যাবে কিনা।

গাড়ি চালিয়ে অফিসে এসে লিফটে করে ওপরে উঠে আমার ঘরের দরজা খোলার সময় শুনতে পেলাম, মিঃ ওয়েডে গম্ভীর গলায় ডিকটেশ দিচ্ছে। মেঝের ওপরে পড়ে থাকা অনেকগুলো চিঠি তুলে ডেস্কের ওপর রাখলাম। ঘরটায় একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। দেখে জানলাগুলো খুলে দিলাম। পরিষ্কার বাতাস ঢোকায় নিশ্বাস নেওয়া বেশ সহজ হল এবং

ওয়েডের গলা আরও স্পষ্ট শোনা গেল। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ওর কথাগুলো শুনলাম। অ্যাডহেসিভ-প্লাস্টার-এর ওপর একটা ডিকটেশন দিচ্ছে। তারপর চিঠিগুলো খুলে দেখলাম দু-তিনটে ছাড়া সবগুলোই মামুলি চিঠি। কাজের চিঠিগুলো রেখে বাকিগুলো ফেলে দিলাম মেঝের ঝুড়িতে।

— টেলিফোনের কাছে গিয়ে জেঃ উইলবার জেফারসনের বড়ি ডায়াল করলাম। লাইনে জেনেৎ-এর গলা পেলাম।

–হ্যালো, আমি মিঃ জেফারসনের সেক্রেটারি কথা বলছি। আপনি কি মিঃ রায়ান কথা বলছেন?

–হ্যাঁ, মিঃ জেফারসনের সঙ্গে কি আজ দেখা করতে পারি?

নিশ্চয়ই। আজ বিকেল তিনটে নাগাদ আসুন।

–ঠিক আছে। যাবো।

–কিছু পাত্তা করতে পারলেন? ওর গলা শুনে বোঝা গেল না যে ও কতটা অধীর।

–ওখানে গিয়ে বলব। রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

একটা সিগারট ধরিয়ে ডেস্কের ওপর একটা পা তুলে ঘড়ি দেখলাম, এখন একটা বাজতে কুড়ি। অল্প অল্প ক্ষিদে পাচ্ছে। এখন আর হংকং-এ নেই, কাজেই সুস্বাদু চীনে খাবার আর পাবো না। এখন আবার সেই স্প্যারোর স্যান্ডউইচ। যাই হোক, পেটে কিছু

একটা দিতে হবে, এই ভেবে স্প্যারোর স্ন্যাকবার-এ গেলাম। মিনিট কুড়ি ধরে হংকং-এর চীনা মেয়েদের সম্বন্ধে বানিয়ে বানিয়ে বলে ওকে চাঙ্গা করে রাখলাম।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ি গেলাম। সেখানে দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে, জামাকাপড় পাল্টে গাড়ি নিয়ে মিঃ জেফারসনের বাড়ি এলাম।

বাটলারটা চুপচাপ আমাকে জেনে ওয়েস্ট-এর অফিস ঘরে নিয়ে গেল। জেনেৎ কি যেন লিখছিল।

–আসুন, মিঃ রায়ান, বসুন। ও বলল।

আমি ওর পাশের একটা চেয়ারে বসলাম। বাটলারটা হ্যামলেটনাটকের ভূতের মত মিলিয়ে গেল।

কাজ বন্ধ করে কোলের ওপর দুটো হাত রেখে সাগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

–আপনার ওখানে যাওয়া কতটা সার্থক হলো? মিঃ জেফারসন মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে যাবেন।

–হ্যাঁ। মোটামুটি কাজ হয়েছে। আমি মানিব্যাগ থেকে ফ্রাংক বেলিং-এ ফটোটা বের করে ডেস্কের ওপর ওর সামনে রাখলাম।

ফটোটা ও দেখতে লাগল।

–আপনি বলেছিলেন এটা হেরম্যান জেফারসনের ফটো। এটা আপনিই আমাকে দিয়েছিলেন মনে আছে?

–আমি এই ছবিটা জেফারসনকে দেখাব। বলব, আপনি বলেছিলেন এটা তার ছেলের ফটো।

জেনেৎ চোখ নীচু করে বলল, ও কি মারা গেছে?

-হেরম্যান? হ্যাঁ, এখন ও মারা গেছে।

লক্ষ্য করলাম, ওর চোখে মুখে বেদনার ছায়া ছড়িয়ে পড়ল। নিশ্চল হয়ে খানিকক্ষণ বসে থেকে চোখ তুলল। মুখে চোখে সব হারানোর বেদনার ছাপ।

-কি হয়েছিল? ও জিজ্ঞাসা করল।

আপনি জানতেন যে ও মাদকদ্রব্য চোরাচালানকারীদের সঙ্গে যুক্ত ছিল?

–হ্যাঁ। আমি জানতাম। জেনেৎ বলল।

যাই হোক, ওদের সঙ্গে ওর ঝামেলা বাধে–ওদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আপনি জানতেন কী করে?

–ও আমাকে সব বলেছিল। ক্লান্ত ভাবে জেনেৎ জবাব দিল। ও আরও বলল, আসলে কি জানেন আমি এমন বোকা যে ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। আর ও আমার বোকামীর সুযোগ নিত। আমার মত বোকারা যারা এই ভুল করে তারা আমারই মত কষ্ট পায়।

–আপনি এই ফটোটা আমাকে দিয়ে কেন বলেছিলেন এটা জেফারসনের ফটো?

–শুধুমাত্র মিঃ জে. জেফারসনকে মানসিক কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্যে। ওর মতো একজন ভদ্রলোকের ছেলে এমন একটা নোংরা ব্যাপারে জড়িত রয়েছে, এটা যেন উনি না জানেন–এটাই আমি চেয়েছিলাম।

-আপনি এই ফটোটা কোথায় পেয়েছিলেন?

–এটা আমাকে হেরম্যান পাঠিয়েছিল। যদিও ওর বাবাকে বছরে একটা চিঠি দিত, আমাকে কিন্তু প্রায়ই চিঠি দিত। একটু ভেবেতারপরে বলল, আপনাকে পুরো ব্যাপারটা আমার বলা উচিত। কয়েক বছর আগে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমাদের দুজনের একটা বাচ্চাও হয়েছিল। যদিও জানতাম ও একটা অপদার্থ, তবুও আমি ওকে ভালবাসতাম। সেটা বুঝেই ও সুযোগ নিত। ও আমাকে প্রায়ই অনেক ফটো পাঠাত।

হঠাৎ একদিন ও বেলিং-এর এই ফটোটা পাঠিয়ে লিখল, এই লোকটার সঙ্গে ও একটা ব্যবসা করতে যাচ্ছে। আমার মনে হয় ও যে মিথ্যে বলছে না সেটা প্রমাণ করতে বেলিং-এর ফটোটা পাঠিয়েছিল। যাই হোক, ও এক হাজার ডলার চেয়েছিল, নতুন করে ব্যবসা করার জন্যে। আমি দিইনি। তারপর ওর কাছ থেকে একটা সাংঘাতিক চিঠি পেলাম–ও ভীষণ বিপদে পড়েছে। ওর চিঠি পড়েই আমি বুঝেছিলাম ওর বিপদের

গুরুত্বটা। ও লিখেছিল যে ও একটা চোরাচালানের দলের সঙ্গে আটকে পড়েছে। ওই দলের লোকেরা ওকে খুন করে ফেলতে চাইছে। সেজন্য ও কোথাও গা ঢাকা দিচ্ছে।

তখনই ও লিখেছিল, বেলিং মারা গেছে কিন্তু লোকে জানে যে ও মারা গেছে। ওর স্ত্রী বেলিং এর বডি নিয়ে এখানে আসছে। এভাবেই ওখানকার লোককে বোঝান যাবে যে ও মারা গেছে। তাহলে দলের লোকেরা আর ওর খোঁজ করবে না। ও যে এত নীচে নেমে গেছে, দেখে আমি সত্যিই খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। আমি চাইনি মিঃ জেফারসন এই আসল সত্যিটা জেনে কষ্ট পাক। তাই এটা...বোধহয় ঠিক হয়নি..তবুও আমি করেছিলাম।

আমি কিছু বললাম না।

ও আবার বলল, ও আমাকে একটা চীনা লোকের ঠিকানা দিয়েছিল। তার নাম ওয়ং হপ হো। আমাকে বলেছিল, কোন বিপদে পড়লে আমি যেন একে চিঠি লিখে জানাই। যখন জো-অ্যান খুন হল এবং দেখলাম মিঃ জেফারসন আপনাকে ওখানে পাঠাচ্ছে, তখন আমি ওয়ংকে চিঠি লিখে সব জানালাম এবং সাবধান করে দিলাম। ওকে আমি বলে দিয়েছিলাম যে আপনাকে আমি বেলিং-এর ফটোটা দিয়েছি। মিঃ জেফারসন যাতে ব্যাপারটা না জানেন, এজন্য। সত্যি বলতে কি আমি একেবারে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলাম।

এখন তো তাহলে ওকে সব কথা জানাতে হবে এবং পুরো ঘটনাটা তার জানা উচিত।

কী দরকার? জেনেৎ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, ওঁর ছেলে কোন রকম অসৎ সঙ্গে ছিলনা, এটা জেনেই ওঁকে মরতে দিন না!

–সেটা আর এখন সম্ভব নয়। কারণ কফিনটা খুলতে হবে। আর এজন্য পুলিস আসছে। ব্যাপারটা আর চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

আমি বললাম, অবশ্য আমি চেষ্টা করব যাতে এই কেসে আপনি জড়িয়ে না পড়েন। এটুকুই মাত্র করতে পারি।

এমন সময় দরজায় একটা টোকা দিয়ে বাটলার ঢুকল।

মিঃ জেফারসন আপনার সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত। সে বলল, আপনি কি আমার সঙ্গে আসবেন?

আমি রাজি হয়ে মিঃ জেফারসনের ঘরে গেলাম। উনি সেই বিছানার পাশে চেয়ারে বসে আছেন। মনে হল, ওকে আগে যখন দেখে যাই, তারপর থেকে উনি আর নড়েননি।

আমাকে দেখে হাত দিয়ে ওঁর কাছের একটা চেয়ারে বসতে বললেন, আমি বসলাম।

তারপর ইয়ংম্যান ফিরে এসেছে। বেশ, আমি নিশ্চয়ই আশা করব তুমি আমার জন্যে কিছু খবর এনেছে।

-হ্যা...তবে অভ্যর্থনা জানানোর মত কোন খবর আমি আনিনি। আপনি আমায় হংকং পাঠিয়েছিলেন খুনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা জেনে আসার জন্যে, আমি যথাসম্ভব তা জেনে এসেছি। আমি বললাম।

আমাকে ভালভাবে লক্ষ্য করে উনি কাঁধ ঝাঁকালেন।

-ঠিক আছে, বল কী খবর আনলে?

মোটামুটি গুছিয়ে আমি হংকং এর ঘটনাগুলো পরপর বললাম। ওর ছেলের সম্বন্ধে যা জেনেছিলাম তাও বললাম। তবে ও কিভাবে মারা গেছে সেটা না বলে শুধু বললাম পুলিস ওর ডেডবডিটা সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেছে।

উনি চুপচাপ সব শুনলেন। একটি কথাও বললেন না, যতক্ষণ না আমি শেষ করলাম।

–তাহলে এখন কী হবে? আমার দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

–পুলিস কফিনটা খুলতে চাইছে। এবং ভল্ট খোলার জন্যে আপনার অনুমতি চাইছে। আমি বললাম।

-ঠিক আছে, ভল্ট-এর চাবি মিস্ ওয়েস্ট-এর কাছে পাবে।

–আপনার ছেলের বডি আমি এখানে আনার ব্যবস্থা করেছি। এ সপ্তাহের শেষে সেটা এসে পড়বে।

ধন্যবাদ। নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিলেন।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইলাম। উনি সামনের দিকে যোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

-হেরম্যান এত নীচে নেমে যেতে পারে, আমি ভাবতেই পারিনি। মাদকদ্রব্যের চোরাচালান পৃথিবীর জঘন্যতম পেশা। জানোয়ার!

আমি চুপচাপ রইলাম।

–যাক্, ও মরেছে ভালই হয়েছে। উনি বলে চললেন, ওর স্ত্রীকে কে খুন করেছে, সেটা বের করেছে? মিঃ জেফারসন বললেন।

না। সেটা এখনও সম্ভব হয়নি।

আপনি কি চান সেটা আমি বের করি?

নিশ্চয়ই। কেন নয়? তোমার টাকা পয়সা যা কিছু প্রয়োজন হবে ওয়েস্টকে বলবে। এই ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। ওকে কে খুন করল, এটা বের করতেই হবে।

-ঠিক আছে। আমি তাহলে ভল্টের গবিটা নেব। আমি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর একটা কথা আপনার ছেলে মারা গেছে। এখন আপনার উত্তরাধিকারী কে হবে?

চোখ কুঁচকে মিঃ জেফারসন আমার দিকে একবার দেখলেন। তারপর বললেন আমার সম্পত্তি কে পাবে, সেটা জেনে তুমি কী করবে?

ব্যাপারটা যদি গোপন কিছু হয়, তাহলে ক্ষমা চাইছি।

আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন।

না। তেমন কিছু নয়, গোপন কিছু নয়, তবে তুমি এটা জানতে চাইছ কেন? উনি বললেন।

–হেরম্যানের স্ত্রী বেঁচে থাকলে আপনার উইলে নিশ্চয়ই ওর নাম থাকত। তাই না? আমি বললাম।

–অবশ্যই। আমার পুত্রবধু সে-সুতরাং সে নিশ্চয়ই আমার সম্পত্তির অংশ পেত।

কতটা অংশ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার সম্পত্তির অর্ধেক।

–তাহলে তো অনেক টাকা। আর বাকি অর্ধেক? আমি ওনার চোখের দিকে চেয়ে রইলাম।

মিস্ ওয়েস্ট। মিঃ জেফারসন বললেন।

–তাহলে মিস্ ওয়েস্ট এখন পুরো অংশটাই পাবেন।

মিঃ জেফারসন চিন্তিত মুখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

হ্যাঁ তাই, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তুমি এত কৌতূহল দেখাচ্ছো কেন?

-কৌতূহলী হওয়াই তো আমার পেশা। বলে আমি চলে এলাম।

জেনেৎ ওর ডেস্কে বসে কাজ করছিল। আমাকে দেখে চোখ তুলে দেখে ঠাণ্ডা গলায় বলল,

–আসুন, মিঃ রায়ান।

আমি বললাম, ভল্টের চাবিটা আমাকে দিতে হবে। পুলিস কফিনটা খুলে দেখবে। আমি রেটনিককে বলেছি চাবিটার ব্যবস্থা আমি করে দেব। মিঃ জেফারসনও কোন আপত্তি করেননি।

ড্রয়ার খুলে জেনেৎ চাবিটা আমাকে দিল। আমি ওকে পুরো ঘটনাটা বললাম এবং চাবিটা পকেটে ঢুকিয়ে বললাম, ব্যাপারটা উনি সহজভাবেই নিয়েছেন।

জেনেৎ মাথা নাড়ল। তারপর বলল, তাহলে এখন কী হবে?

আমার পরবর্তী কাজ এখন জো-অ্যানের খুনীকে খুঁজে বের করা।

–এটা কী করে করবেন? জেনেৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল।

–সব খুনের পেছনেই একটা মোটিভ থাকে। এবং আমি নিশ্চিত যে অ্যানের খুনের পেছনেও মোটিভ আছে। সেই মোটিভটা কী তাও আন্দাজ করতে পারছি। যা আমি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করব না। কাজ হয়ে গেলে চাবিটা দিয়ে যাবো।

চলে এলাম। বাটলারটা বোবার মত আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। গাড়িতে ওঠার আগে একবার বাড়িটার দিকে তাকাতেই দেখলাম জেনেৎ ওয়েস্টের পর্দায় একজনের ছায়া সরে গেল।

জেনেৎ আমার চলে যাওয়া লক্ষ্য করছিল।

.

৪.২

লেফটেন্যান্ট রেটনিক এবং সার্জেন্ট পুলস্কি দুজনে পুলিসের গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে সমাধি ক্ষেত্রে ঢুকল।

–পৃথিবীতে যে জায়গা দেখতে আমার সবচেয়ে ঘেন্না করে সেটা এখন আমায় দেখতে হচ্ছে। রেটনিক দাতে চুরুট চেপে বলল।

–আমাদের সবাইকেই একদিন এখানে আসতে হবে। আগে অথবা পরে এটাই তো ভবিষ্যত এবং চিরস্থায়ী ঠিকানা। আমি বললাম।

-সেটা আমি জানি তোমাকে আর শেখাতে হবে না। আমাকে খেঁকিয়ে উঠল।

দরজা দিয়ে ঢুকে সামনের রাস্তা দিয়ে আমরা এগোচ্ছিলাম। আমাদের দুদিকে সুদৃশ্য অনেকগুলো স্তম্ভ।

–ঐ দিকে। পুলস্কি বলে উঠল, ঐ সারির চার নম্বরটা। আমরা নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে খুব সুন্দর একটা সমাধির কাছে এলাম। দেখলেই বোঝা যায় বেশ খরচ করা হয়েছে এর পেছনে।

–এইটা, পুলস্কি বলল।

আমি পকেট থেকে চাবিটা বের করে ওকে দিলাম।

–জেফারসন তোমাকে কী বলল? পুলস্কি স্তম্ভের দরজা খোলার সময় আমাকে রেটনিক জিজ্ঞাসা করল, ও নিশ্চয়ই আমার নামে তোমাকে কিছু বলেছে।

–একী! ভয়ার্ত গলায় পুলস্কি চীৎকার করে উঠল। আমাদের আগে এখানে কেউ এসেছিল।

রেটনিক আর আমি দেখলাম, ভল্ট-এর দরজায় একটা ঠেলা মারতেই ওটা খুলে গেল। কোন বড় ধরনের লিভার দরজা আর তালার মাঝখানে ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে তালা ভাঙা হয়েছে। দরজার পাশের পাথরে ফাটল ধরেছে।

-কেউ কিছু ছুঁয়োনো। রেটনিক বলল, আমরা এখান থেকেই দেখি।

ভল্ট এর মধ্যে ফ্লাশ লাইট ফেলতেই দেখা গেল চারটে সেলফ, তাতে চারটে কফিন। একেবারে নীচের সেলফের কফিনের ঢাকনাটা ভোলা। ঢাকনাটা দেওয়ালে লাগান! কফিনের ভেতরটা ভালভাবে দেখলাম, ওখানে লম্বা একটা সীসার পাত পড়ে রয়েছে, আর কিছু নেই।

রেটনিক বলল, দেখেছ! কেউ বডিটা চুরি করে পালিয়েছে।

–হয়ত আদৌ কোন বডি ছিলনা, এতে। আমি বললাম। আমার দিকে ফিরে রেটনিক অধৈর্যভাবে খেঁকিয়ে উঠল। রাগে থমথমে মুখ।

কী বলতে চাও কি তুমি। আর কত তুমি জান, যা আমাকে বলনি?

-আমি যা জানতাম সব বলেছি। শান্তভাবে বললাম, তাই বলে মগজটা খাটাবো না, তা তো হয়না।

জ্বলজ্বলে চোখে পুলস্কির দিকে তাকিয়ে রেটনিক বলল, এই কফিনটা বের করে হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দাও পরীক্ষা করার জন্যে। হাতের ছাপটাপ পাওয়া যেতে পারে। ততক্ষণে আমি আর এই চালাক টিকটিকি একটু ঘুরে আসছি।

তারপর আমাকে খামচে ধরে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বাইরে নিয়ে এল। পুলস্কি পুলিস হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

পুলস্কির থেকে একটু দূরে একটা সমাধির ওপর বসে রেটনিক বলল,

বল টিকটিকি,–কী ছাইপাঁশ তোমর মগজে এসেছে বল।

-আমার মগজে এখুনি কিছুই আসেনি। আপনার কি একবারও ভেবে অস্বস্তি হচ্ছে না যে, আপনি এখন কোন মৃত স্ত্রী অথবা কারুর স্বামী বা মায়ের ওপরে বসে আছে।

–আমি কোথায় বসে আছি, সেটা ভাবার মত অবস্থা এখন আমার নেই। আজ সকালে মেয়র আমাকে ফোন করেছিল।... আমার সেই প্রভাবশালী শালা..বুঝেছ? জানতে চেয়েছে আমি কবে নাগাদ এই খুনের কেসটা সমাধান করছি। রাগে চুরুটটা কামড়াতে কামড়াতে বলল, বুঝলে কিনা! আমার আপন শালা, সেও আমার ওপর চাপ দিচ্ছে।

আমি চুপ থাকলাম।

–তোমার কেন মনে হল, কফিনটা ফাঁকা ছিল?

এটা আমার ধারণামাত্র। বেলিং-এর দেহ তো পুড়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল। কোনভাবে ওর দেহ সনাক্ত করা যাবেনা। সুতরাং ওটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ায় কি লাভ? জেফারসনের বডি ওতে ছিলনা। ভারী করার জন্যে কিছু সীসা ওতে ভরে পাঠানো হয়েছে।

রেটনিক গুম হয়ে রইল।

–তাহলে তালা ভেঙে খোলার কি দরকার ছিল?

ও প্রশ্ন করল।

–তা অবশ্য ঠিক। হঠাৎ ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হলো। আমি লাফিয়ে উঠে নিজের হাতে ঘুসি মেরে বললাম, ইস্! কী বোকার মত এতক্ষণ ভাবছিলাম। ঠিক ঠিক। একদম সোজা ব্যাপার। প্রথমেই এটা চিন্তা করা উচিত ছিল আমার।

রেটনিক আমার দিকে তাকিয়ে গরগর করতে লাগল।

কী নিজের মনে বকছ?

–হেরোইন। কফিনের মধ্যে হেরোইন ছিল। আমি বললোম। দু-হাজার আউন্স! আর এটাই তো লুকোনোর পক্ষে নিরাপদ জায়গা।... এবং হংকং থেকে স্মাগল করার সবচেয়ে ভাল পথ!

রেটনিক আমার কথা শুনে লাফিয়ে উঠল।

এরপর আমি বলে যেতে লাগলাম, জেফারসন হেরোইন নিয়ে গা ঢাকা দিল। কিন্তু খুব শীগগিরই ও বুঝতে পারল ও নিজের জালে নিজেই ধরা পরেছে। প্রথমতঃ ও হংকং ছেড়ে যেতে পারছে না। দ্বিতীয়তঃ দলের লোকেরা ওকে ছাড়বে না। অত টাকার হেরোইন! কাজেই ও দলের লোককে বোঝাতে চাইল যে ও মারা গেছে। অবশ্য এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল। জো অ্যানকে দিয়ে ওর বাবাকে টাকা পাঠাতে বলেছিল যাতে করে ওর বডি আমেরিকায় ফেরৎ আনা যায়। ওর কাছে টাকা-পয়সা নেই, কাজেই বাপের টাকায় কফিনটা খালাস করে নিতে হবে। আর মনে হয় কফিনে প্রথমে বেলিং-এর বডি ভরে সেটা আমেরিকান কনস্যুলের অনুমতি আদায় করে। তারপর কোন এক সময় বডিটা সমুদ্রে ফেলে ঐ জায়গয় হেরোইনটা ভরে নেওয়া হয়,

সঙ্গে সীসা। জেফারসন নিজে হংকং-এ আটকে পড়লেও ও নিশ্চিত ছিল যে ওর স্ত্রী হেরোইন নিয়ে আমেরিকা পৌঁছে গেছে।

রেটনিক খুব আশার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু মালটাকে সরালো কে?

-সেটা এখনও আমি ঠিক বলতে পারছি না। ম্যাকার্থী বলেছিল, জেফারসনের বডি যেভাবে পাওয়া গিয়েছিল তাতে বোঝা গিয়েছিল, ওকে মারার আগে ওর ওপর সাংঘাতিক রকম শারীরিক অত্যাচার করা হয়। সেই সময় হয়তো ও সত্যি কথাটা বলে ফেলে। তখন ওর দলের কাউকে এখানে পাঠানো হয়, কফিনটা ভেঙে মালটা সরিয়ে ফেলার জন্যে। সঠিক কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

রেটনিকের মুখ অন্ধকার থেকে আলোয় আসার মত উজ্জ্বল হল।

ব্যাপারটার মোটামুটি একটা হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। যাকগে এ নিয়ে আর আমার মাথাব্যথা নেই। হেরোইনের ব্যাপারটা নারকোটিক ডিপার্টমেন্টের কাজ, ওরা বুঝবে।

কিন্তু এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, চীনা মেয়েটা আমার অফিসে কেনই বা এসেছিল আর কেনই বা খুন হল? আমি বললাম।

রেটনিকের সেই উজ্জ্বল মুখ নিমেষে ম্লান হয়ে গেল।

-হ্যাঁ, এটাও একটা চিন্তার ব্যাপার।

-আমি অবশ্য একটা আইডিয়া নিয়ে এগোচ্ছি যে, হেরোইনের সঙ্গে এই খুনের কোন সম্পর্ক নেই। আমি বললাম,

বেঁচে থাকলে জো-অ্যান বৃদ্ধ মিঃ জেফারসনের অর্ধেক সম্পত্তি পেত। আজ বিকেলে এখবরটা ওমার থেকে পেলাম। কিন্তু জো-অ্যানের মৃত্যুতে পুরো সম্পত্তিই পাচ্ছে মিস্ জেনেৎ ওয়েস্ট।

রেটনিক চোখ কুঁচকে তাকাল।

–তার মনে জেনেৎ ওয়েস্ট মেয়েটাই ওকে খুন করেছে? রেটনিক আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল।

-না, এখনও তা মনে করিনা। তবে দশ লক্ষ ডলারের মালিক জেনেৎ হতে পারে এটা ও চিন্তা করে। ওর কোন উচ্চাকাঙ্খী বয়ফ্রেন্ড থাকতে পারে। তবুও মেয়েটা কেন আমার অফিসে এলো, সেটা এখনও পরিষ্কার নয়।

রেটনিক নিস্পৃহভাবে বলল, ঠিক আছে আমি খবর নেব ওর কোন বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা।

এমন সময় পুলস্কি ওকে ডাকল।

–ঠিক আছে টিকটিকি, আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখ–এই কাজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলতে হবে। বলে রেটনিক পুলিশের গাড়ির দিকে ছুটল। পুলস্কির হাতে পুলিশ টেলিফোনের মুখটা চেপে ধরা।

আমি গাড়ি চালিয়ে অফিস ব্লকের সামনে চলে এলাম। সাড়ে পাঁচটা বাজে। ঘরে ফিরতেও ইচ্ছে করছে না, আবার অফিসেও কিছু করার নেই। দরজার তালা খুলে বাইরের ঘরটায় বসলাম। তারপর বড় ঘরের তালা খুলে ঢুকে একটা সিগারেট ধরালাম।

জেনেতের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। যে লোকটা হার্ডউইক বলে পরিচয় দিয়েছিল সে কি জেনেৎ-এর বয়ফ্রেন্ড? এবং ঐ লোকটাই কি জো-অ্যানকে খুন করেছে? তাই যদি হয় তবে আমার অফিসটাকে বেছে নিয়ে আমাকে এই খুনের ব্যাপারে জড়াবার কারণ কি?

জেনেৎ এই খুনের সঙ্গে জড়িত এটা মন থেকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারছিলাম না। ওর সঙ্গে কথা বলে ওকে ওই ধরনের মেয়ে মনে হয়নি। আবার দশলক্ষ ডলারের হাতছানি! ওর বয়ফ্রেন্ড হয়ত ওকে কিছু না জানিয়ে এটা করেছে।

জো ওয়েডের গলা শুনতে পেলাম। আমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। ও বলল, আমি এখন চলে যাচ্ছি। কাল সকালে দেখা হবে। জানলা দিয়ে ওর গলা ভেসে এল। তারপর বুঝলাম ও বেরিয়ে গেল। ওয়েডে ভারী পা ফেলে লিফটের দিকে গেল ও লিফটে করে নেমে গেল।

আমি আবার চিন্তায় ডুবে গেলাম।

ঠিক কিভাবে এগোবো এটা ভাবতে ভাবতে ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেছে। এমন সময় দূরে একটা প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ পেলাম এবং এটা আস্তে আস্তে খুব জোর হয়ে তারপর মিলিয়ে গেল। আমি চেয়ারের ওপর লাফিয়ে উঠলাম।তারপরেই একটা জেট প্লেনের

রানওয়ে ছাড়ার আওয়াজ। আমার মনে হল এটা একদম সেইরকমআওয়াজ,যখন আমি হার্ডউইকের সঙ্গে কথা বলার সময় ফোনের ভৈতর দিয়ে শুনতে পেয়েছিলাম। আমি তাড়াতাড়ি টেলিফোনে কান পাতলাম। একটা ব্যস্ত এয়ারপোর্টের শব্দ আমার কানে এল। শব্দটা যে কোথা থেকে আসছে আমার আর কোন সন্দেহ রইল না। উত্তেজনায় আমার বুক দপদপ করতে লাগলো। আমি আস্তে আস্তে ওয়েডের ঘরের হাতল ঘুরিয়ে ঘরে এসে ঢুকলাম।

ওয়েডের সেই চশমাধারী,ইঁদুরমুখো সেক্রেটারি একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে ওরই ডেস্কে বসে কাজ করছে। লাউডস্পীকার দিয়ে ব্যস্ত এয়ারপোর্টের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

–আমি ভাবলাম, আপনাদের অফিসটা বোধহয় একটা ব্যস্ত এয়ারপোর্ট হয়ে গেছে। আমি বললাম।

আমাকে দেখে সেক্রেটারির মুখ সাদা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি রেকর্ডারের সুইচ বন্ধ করল।

আমি হেসে ওকে অভয় দিলাম।

–আপনি এত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? আমি বললাম, শব্দটা শুনে কৌতূহল হল তাই এলাম।

না...মানে, টেপটা একটু চালিয়ে দেখছিলাম। মিঃ ওয়েডে তো বাড়ি চলে গেছেন।

–ঠিক আছে, ঠিক আছে এটা আর একবার চালান না, রেকর্ডিংটা খুব সুন্দর হয়েছে। আমি আর একবার শুনি।

না, সেটা বোধহয় ঠিক হবেনা। মিঃ ওয়েডে এটা পছন্দ করবেন না।

-না, না, উনি কিছু মনে করবেন না। আমি ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং বললাম, বেশ দামী মেসিন–তাইনা?

রিউইন্ড বাটনটা টিপতেই রেকর্ডারটা চালু হয়ে গেল, তখন প্লে-ব্যাক বাটন টিপে এয়ারপোর্টের পরিষ্কার আওয়াজ শুনতে পেলাম। বেশ কয়েক মিনিট ধরে আওয়াজটা শুনে টেপটা বন্ধ করলাম। মেয়েটার দিকে চেয়ে হাসলাম।

সুতরাং...আমি নিশ্চিত যে জন হার্ডউইককে আমি খুঁজে পেয়েছি। রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েছি।

এই মেয়েটার সামান্য কৌতূহল আর আমার ভাগ্য এই দুটোর জন্যেই এটা সম্ভব হল।

–মিঃ ওয়েডে তো কালকের আগে আসছেন না? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

–না।

–ঠিক আছে। আমি কালই ওর সঙ্গে দেখা করে নেব।অফিসে ফিরে এসে সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখলাম উত্তেজনায় আমার হাত থরথর করে কাঁপছে।

আধ ঘণ্টা ধরে বসে রইলাম। ছটার একটু পরে ওয়েডের সেক্রেটারি মেয়েটা অফিস বন্ধ করে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। যতক্ষণ না লিফট এবং এই তলার সব লোক নেমে চারিদিক চুপচাপ হল আমি ঠায় বসে রইলাম। তারপর উঠে প্যাসেজের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। না, কোন ঘরে আলো জ্বলছে না, কেউ কোথাও নেই। এখন এই তলায় শুধু একা আমি।

আমার ড্রয়ার খুলে একগোছ চাবি পকেটে পুরলাম। তারপর বেরিয়ে এলাম। এক মিনিটের মধ্যে চাবি ঘুরিয়ে মিঃ জেঃ ওয়েডের ঘরের তালা খুলে ফেলে চারদিকে তাকালাম, একদিকে দেওয়ালে একটা সবুজ রং এর স্টীলের ফায়ার পুফ কাপ বোর্ড রয়েছে। তালাটা দেখলাম। আমার কাছে যে চাবিগুলো আছে সেগুলো দিয়ে এই তালাটা খোলা যাবে না। অফিসে ফিরে গিয়ে কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে এলাম। আবার ঢুকে ওয়েডের ঘরে তালা দিয়ে দিলাম।

মিনিট পনের চেষ্টা করার পরেও যখন তালাটা খুলতে পারলাম না, তখন ভাবলাম তালাটা ভেঙে ফেলতে হবে। আবার তালা না ভাঙারই সিদ্ধান্ত নিলাম। অন্য ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঘরে রয়েছে একটা ডেস্ক, একটা ফাইলিং ক্যাবিনেট, একটা টাইপরাইটার একটা চেয়ার। ফাইলিং ক্যাবিনেটটা খুঁজলাম। কিন্তু কিছু কাগজ-পত্র ছাড়া সেখানে আর কিছুই পেলাম, না।

আমি যা খুঁজছি সেটা এই অফিসে যদি থাকে তো এই কাপ-বোর্ডেই আছে।

এয়ার পোর্টের শব্দ রেকর্ড করা টেপটা নিয়ে নিলাম এবং ডেস্কের ড্রয়ার থেকে আর একটা টেপ বের করে সেখানে রেখে দিলাম। ওর ঘরের সব আলো নিবিয়ে, দরজা খোলা রেখে আমার অফিসে চলে এলাম।

টেপ রেকর্ডারটা একটা গোপন জায়গায় রেখে টেলিফোন গাইড খুঁজে মিঃ ওয়েডের বাড়ির নম্বর বের করলাম। ওর বাড়ি লরেন্স অ্যাভি-তে এই অফিস থেকে গাড়ি চালিয়ে দশ মিনিটের পথ। ওর টেলিফোন নাম্বার ডায়াল করে কোন উত্তর পেলাম না।

একবার ভাবলাম রেটনিককে খবরটা দেব কিনা।না, ব্যাপারটা আপাততঃ নিজের হাতেই থাক। অবশ্য আমার ধারণা ভুলও হতে পারে। যাই হোক, ওয়েডের সঙ্গে কথা বলার পর রেটনিককে জানাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

অনেকবার ডায়াল করার পর, রাত নটা নাগাদ লাইন পেলাম। ও- প্রান্তে মিঃ ওয়েডের গলা পেলাম।

–আমি নেলসন রায়ান বলছি। আমি বললাম।

কী ব্যাপার বলুন। খুব অবাক হয়ে গিয়ে বলল, আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি? আপনার বেড়ানো কেমন হল?

–ভাল..আমি অফিস থেকে বলছি। আমি একটা জিনিষ ভুলে ফেলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি, আপনার ঘরের দরজা খোলা আর আলো নেভানো। আপনার মেয়েটিও নেই,

মনে হয় ও তালা দিতে ভুলে গেছে। আমি কি দারোয়ানকে বলব আপনার ঘরে তালা দিয়ে দেবে? টেলিফোনেই ওর চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম।

-আশ্চর্য! অনেকক্ষণ বাদে ও বলল, ঠিক আছে, আমি আসছি।

–দেখে মনে হচ্ছে, চুরির ধান্দায় কেউ আপনার ঘরে ঢুকেছিল।

–চুরি করার আর কী আছে? ঠিক আছে, দেখছি আমি।

আপনি যদি ভাল মনে করেন, তবে আমি দারোয়ানকে বলে ঘর বন্ধ করার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

না...ধন্যবাদ। আমি যাচ্ছি। আমি বুঝতে পারছি না, ও কী করে ঘরে তালা দিতে ভুলে গেল! ও তো এরকম ভুল কখনও করেনি।

–হয়তো কারোর প্রেমে পড়েছে–আমি হেসে বললাম, তাহলে এবার আমি ফোন রাখছি–আমাকে আর কিছু করতে হবে না তো?

— না, না। টেলিফোন করার জন্য ধন্যবাদ।

–তাতে কী হয়েছে...।

আমার ঘরের আলো নিবিয়ে দরজায় তালা দিয়ে পিস্তলটা সঙ্গে নিয়ে ওয়েডের অফিসে গিয়ে ঢুকলাম। ওর সেক্রেটারির ডেস্কে বসে পিস্তলটা রেডি করে আমার পাশে ডেস্কের ওপর রাখলাম।

মিনিট দশেক পর লিফটের ওপরে ওঠার শব্দ পেলাম। ডেস্ক থেকে উঠে পিস্তলটা হাতে নিয়ে, দরজার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে শুনতে লাগলাম প্যাসেজে এত্ত পায়ে এগিয়ে আসার শব্দ। ওয়েডে ঘরে ঢুকেই আলো জ্বালালো। আমি ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে ওকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। ও ঘরের চারদিকে তাকিয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে আমি যে ঘরে আছি, সেই ঘরের দরজা খুলল। আমি আরো দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে গেলাম। তারপর এক ঝলক ঘরের ভেতর দেখে গিয়েই ও তারপর বাইরের ঘরে এল। তারপর চাবির গোছার শব্দ পেলাম এবং তারপর একটা তালা খোলার শব্দ। আন্দাজ করলাম, ও কাপবোর্ডের তালা খুলল।

আমি দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ওয়েডে কাপবোর্ডের পাল্লা খুলে হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে আছে। তাতে ঠাসা বোতল, বাক্স এবং অন্যান্য রাসায়নিক জিনিষের স্যাম্পল।

-হেরোইনটা কি এখানে আছে? খুব ঠাণ্ডা গলায় আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ওয়েডে চমকে আমার দিকে তাকাল। তারপর ওর মুখটা সাদা হয়ে গেল। আমি পিস্তলটা অল্প তুললাম, যাতে ও দেখতে পায়। আস্তে আস্তে ও উঠে দাঁড়াল।

–আপনি এখানে কী করছেন? ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করল।

আমি কাপবোর্ডের তালাটা খোলার চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি। ওর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, সুতরাং ভাবলাম আপনি যদি নিজে এসে এটা খুলতে আমাকে সাহায্য করেন। ওখান থেকে সরে দাঁড়ান, কিছু করার চেষ্টা করবেন না।

কিন্তু কেন? স্খলিত পায়ে ওয়েডে ডেস্কের দিকে এগিয়ে গিয়ে তারপর ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে, দু-হাতে মুখ ঢাকল।

বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একদম নীচের তাকে প্রায় পঞ্চাশটা নিখুঁত ভাবে প্যাক করা পার্সেল পড়ে আছে।

–ঐগুলিই তো জেফারসন নিয়ে লুকিয়েছিল? ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। ও পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে মাথা নাড়ল।

–হ্যাঁ আপনি কি করে জানলেন?

–আপনার টেপ-রেকর্ডারে এয়ারপোর্টের শব্দ টেপ করা ছিল, সেটা আপনি নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন। আপনার মেয়েটা একবার ভুল করে ওটা চালালে আমি শুনতে পেয়ে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারি।

আমার বড় ভুলো মন। সব কাজেই একটা না একটা ভুল থেকে যায়। ক্লান্ত স্বরে ওয়েডে বলল। আপনি যখন হংকং যাওয়ার কথা বললেন, তখনই বুঝেছিলাম, আমার

শেষ সময় এসে গেছে। কেননা আমি জানতাম কোথাও না কোথাও একটা ভুল করে ফেলব। আপনার যাওয়ার সব ঠিক দেখে লোক দিয়ে আপনাকে খুন করার চেষ্টা করি, কিন্তু ব্যর্থ হলাম। আমি বুঝলাম এবার আমাকে ধরা পড়তেই হবে।

–আমি ভেবেছিলাম জেফারসনের সেক্রেটারি জেনেতও এর সঙ্গে জড়িত। কারণ ওরও একটা মোটিভ আছে। আমি বললাম।

আমি আশা করেছিলাম, আপনি ওকেই ধরবেন। ও বলতে লাগল, সেইজন্যই আমি জেফারসনের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা অত জোর দিয়ে বলেছিলাম। কিন্তু আমি এটাও ভেবেছি যে হংকং-এ গিয়ে যদি আপনি জেফারসনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, তাহলে আমি ধরা পড়বই।

–আপনি জানলেন কিভাবে জো-অ্যান এখানে হেরোইন নিয়ে আসছে? আমি প্রশ্ন করলাম।

–সব বন্দোবস্ত ছিল। জেফারসন সম্বন্ধে আপনাকে একটি ছাড়া সবই সত্যি বলেছি। আমি বলেছিলাম ওকে আমি ঘেন্না করি, কিন্তু আগাগোড়াই আমরা ভীষণ বন্ধু, যোগাযোগও ছিল। গত দুবছর আমার ব্যবসা ভাল চলছিল না। আর ব্যবসা করার মত মানসিক অবস্থাও আমার নেই।

এব্যাপারে ওর সঙ্গে আমার খুব মিল। টাকা পয়সার জন্যে আমি যখন ক্ষেপে উঠেছি, এমন সময় হেরম্যান লিখল যে ওর কাছে বেশ কিছু হেরোইন আছে। আমি কিনব কিনা। ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট হিসাবে হেরোইনেরব্যবসারকতকগুলো চ্যানেল আমার জানা

ছিল।কাজেই রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু টাকা আমার কাছে নেই, অবশ্য জেফারসনও আমাকে বোকার মত জানিয়েছে যে ও হংকং-এ আটকে পড়েছে।দলের সঙ্গে বেইমানিকরতে গিয়ে ওর ঐঅবস্থা। জো-অ্যানটাকা জোগাড় করেএকটাফল পাসপোর্টেরব্যবস্থানাকরতে পারলে ও হংকং ছেড়ে পালাতে পারবেনা।আমারসুযোগ এল।আমিও লিখলামঅ্যানকেদিয়ে হেরোইনটা পাঠাতে।টাকাএখানেআমি দিয়ে দেব।ঠিক ছিলঅ্যানএয়ারপোর্ট থেকে মালটা নিয়ে সোজা এখানে চলে আসবে, আমি দাম মিটিয়ে দেব। তখন থেকেই আমার চিন্তা মেয়েটাকে খুন করতে পারলেই, পয়সাকড়িনা দিয়েই মালটা আমার হস্তগত হবে।–চোখনীচু করে নিজেরহাতের দিকেতাকাল। তারপর বলল, ওকে খুনকরাশক্ত কাজ কিছুনয়।তবেবডিটা কিকরব? তখন ঠিক করলাম, এটা আপনার অফিসে হয়েছে এটা বোঝালে পুলিস ভাববে ও আপনার মক্কেল। পুলিস আপনাকে জড়াবে, আর আমি মাঝখান থেকে পরিষ্কার, তবে ও যখন আসবে তখন আপনাকে অফিস থেকে সরাতে হবে। তাই ঐএয়ারপোর্টেরশব্দ করে ফোন করলাম। কারণ এয়ারপোর্টে যাচ্ছি এটা জানালে অসুবিধা হতে পারে।

তাই ঐ টেপের ব্যবস্থা করেছিলাম। এবং আমি দেখা না করার একটা জুতসই কৈফিয়ৎও দিয়েছিলাম। আপনি চলে যাওয়ার পরে আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম।...ও আর আসে না, অবশ্য ও কোন্ প্লেনে আসবে সেটা আমি জানতাম না। শেষে ও এল। আমাকে বিশ্বাস করে বলল, হেরোইনটা কফিনের ভেতর আছে। আমি খুব কাছ থেকে ওকে খুন করি। মেয়েটা খুব সুন্দর ছিল। আপনার অফিস থেকে একসময় পিস্তলটা নিয়ে আসি। ও যখন কথা বলছিল তখন ওর নজর এড়িয়ে ডেস্কে রাখি। শেষে ও যখন টাকা চাইল কোনরকম দেরী না করে ওকে গুলি করি। তারপর ওকে তুলে আপনার অফিসে নিয়ে যাই। যা ব্যাপারটা এখন শেষ। তারপর থেকে এক

রাত্তিরও আমি ঘুমতে পারিনি। মালটাও বেচতে পারিনি। ঐ তো ওখানে সব রয়েছে। আমি আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু আপনি আসার পর আপনার সঙ্গে দেখা করার মত স্নায়ুর জোরও আমার ছিল না।

আমার দিকে তাকিয়ে ওয়েডে বলল, এখন আপনি কি করবেন?

আমার ওর জন্য কোন দয়া নেই। ও আমাকে খুনের কেসে ঝোলাতে চেয়েছে। আমাকে গুণ্ডা লাগিয়ে খুন করতে চেয়েছে। আমি ওকে ক্ষমা করতে পারিনা। সাংঘাতিক লোভে ও ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান করে খুনটা করেছে। এবং নিজের বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অবশ্য বন্ধুও ঐ একই পর্যায়ের।

আপনি কি মনে করেন? আপনার সব ঘটনা পুলিসকে বলতে হবে। আমি বললাম।

টেলিফোন ডায়াল ঘোরালেই ওয়েডে দরজার দিকে এগোল। আমি ইচ্ছে করলেই ওর পায়ে গুলি করে থামাতে পারতাম কিন্তু করলাম না কারণ ও বেশীদূর যেতে পারবে না। আর রেটনিক না আসা পর্যন্ত হেরোইন আমাকেই পাহারা দিতে হবে।

পুলিস হেডকোয়ার্টারে ফোনে ব্যাপারটা জানিয়ে বললাম এক স্কোয়াড পুলিস নিয়ে যেন রেটনিক তাড়াতাড়ি আসে। টেলিফোন রাখার সময় লিফটু নামার শব্দ পেলাম। পুলিস আধঘণ্টার মধ্যে ওয়েডেকে খুঁজে বের করল। বীচ-ড্রাইভে ওর গাড়িতে সায়ানাইড ক্যাপসুল খেয়ে ও তখন পরলোকে। কেমিস্টহয়ে ও এই সুবিধেটা পেয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি ও সব জ্বালা মেটাতে পেরেছে। সব ঘটনা রেটনিক আমার মুখে শুনে তেঁতো মুখে আমার দিকে তাকাল।

দেখুন, আমি ভেবেছিলাম জেফারসনের সেক্রেটারী এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। ওয়েডে যদি টেপটা না রেখে যেত তাহলে ওকে ধরতে পারতাম কিনা জানি না।

রেটনিক আমাকে চুরুট দিল।

-দেখ রায়ান। এই কেসের কৃতিত্বটা আমি নেব। আমার বাজারে একটা সুনাম আছে। তোমার নেই। তবে ভবিষ্যতে তোমাকে আমি সাহায্য করব কথা দিচ্ছি, এটা এখন বাজারে ছেড়ে আমি আমার পাবলিসিটি করতে চাই।

–আপনি আমাকে দেখলে আমি আপনাকে দেখব। বললাম, তবে একটা কথা খেয়াল রাখবেন লেফটেন্যান্ট। বৃদ্ধ ভদ্রলোক চাইবেন ব্যাপারটা চাপা থাকুক। কারণ ওর ছেলে স্মাগলার কেউ না জানুন, এটাই চাইবেন। কাজেই ওনার কৃপা দৃষ্টিতে পড়তে চাইলে ব্যাপারটা চেপে যান। পাবলিসিটির কথা ভুলে যান। আপনার ভাগ্য ভাল ওয়েডে মারা গেছে।

রেটনিক মেঝের দিকে তাকিয়ে গুম মেরে কিছু চিন্তা করতে লাগল।

আমি নীচে নেমে এলাম। পুরো ঘটনাটায় একজনের জন্যে আমি দুঃখ অনুভব করলাম–সেই মিষ্টি মেয়ে লেইলা।

ওর কথা চিন্তা করতে করতে রাস্তা পেরিয়ে আর একবার একা একা রাতের খাওয়ার জন্যে স্প্যারোর স্ন্যাক্স বার-এ গিয়ে ঢুকলাম।

পড়তে পড়তে টাল সামলে নিলেন। ওর দিকে আমি ছুটে গেলাম এবং বারবার ভদ্রমহিলার

[অসমাপ্ত]